পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৭ বর্ষ ॥ ১৫ ও ১৬শ সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা)

২৫শে রমযান, ১৪১৬ হিঃ ॥ ৩রা ফাল্গুন, ১৪০২ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচীপত্র

পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)
অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক ৪

হাকিকাতুল ওহী
মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহদী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)
অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫

জুমুআর খুৎবা
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ১০

ঈদুল ফিতরের খুৎবা
সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)
অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ২২

চলতি দুনিয়ার হালচাল ঃ এ চিত্র ধরে রাখা দরকার
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ২৭

আহ্‌মদীয়া তবলীগী পকেট বুক
মূল ঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ
ভাষান্তর : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ২৯

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত এলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পটভূমি
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ৩৭

মুসলেহ মাওউদ-এর দাবী
সংগ্রহ ও অনুবাদ : মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের ৪৩

আল্‌ মাওউদ খেতাব
অনুবাদ : জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ ৪৪

প্রতিশ্রুত পুত্র
আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৪৬

এক নজরে মাহমুদ চরিত
সংকলন ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ৫৩

যাকাতের গুরুত্ব এবং অবস্থাপন্নদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৫৬

বিয়ে-ফরম সম্বন্ধে নির্দেশাবলী ৫৭

ছোটদের পাতা
পরিচালক ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৬১

সংবাদ ৬৬

সম্পাদকীয় ঃ ৬৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৭তম বর্ষ : ১৫ ও ১৬শ সংখ্যা

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ : ১৫ই তবলীগ, ১৩৭৫ হিঃ শামসী : ৩রা ফাল্গুন ১৪০২ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্ নিসা-৪

৫। এবং তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তোমাদের দেন-মহর (৫৬৩) স্বেচ্ছায় প্রদান কর। অতঃপর, তাহারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (৫৬৪) উহা হইতে কিয়দংশ তোমাদিগকে দিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা উহা রুচি ও তৃপ্তি সহকারে ভোগ কর।

৬। এবং তোমরা অবুঝদিগকে (৫৬৫) তোমাদের ধন-সম্পদ (৫৬৬) দিও না যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবলম্বন স্বরূপ করিয়াছেন, কিন্তু উহা হইতে তাহাদিগকে রিয্‌ক দান কর এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দান কর তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বল।

৫৬৩। 'সাদুকাত' শব্দটি 'সাদুকা' এর বহুবচন। 'সাদুকা' অর্থ মহরানা (যে পরিমাণ অর্থ স্বামী স্ত্রীকে দাবী করা মাত্র দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া বিবাহ করে)—বিবাহ উপলক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে যাহা কিছু দান করে (লেইন)।

৫৬৪। এই আয়াতটি একাধারে বরের উপর এবং কন্যার অভিভাবকের উপর প্রযোজ্য। কন্যার অভিভাবক বা আত্মীয়দের উপর প্রয়োগে ইহার অর্থ হইবে তাহারা যেন নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কন্যার মহরানার টাকা হইতে কিছুই খরচ না করে, বরং সাকল্যটাই কন্যার হাতে অর্পণ করে। প্রাথমিকভাবে আয়াতটি স্বামীর উপরই প্রযোজ্য। স্বামী যাহাতে চুক্তি ও অঙ্গীকার মোতাবেক মহরানার টাকাটা স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বিনা দ্বিধায় ও সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করে, আয়াতটিতে সেই নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। 'স্বেচ্ছায় মহরানার অর্থ প্রদান কর' বাক্যটি এই কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, মহরানার অঙ্ক যেন স্বামীর সামর্থ্যের সীমার বাহিরে না হয় এবং ইহা পরিশোধ করিতে স্বামীর যেন প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি না হয়, বরং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পরিশোধ করিতে পারে।

৫৬৫। 'অবুঝদিগকে' দ্বারা এই আয়াতে এতীমদের কথা বুঝাইয়াছে বটে। তবে,

৭। এবং তোমরা এতীমদের (বুদ্ধিমত্তা) পরীক্ষা করিতে থাক যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহের বয়সে উপনীত হয়, অতঃপর, যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে পরিণত বিচার-বুদ্ধি (৫৬৭) অনুভব কর, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ অর্পণ কর; এবং তাহারা বড় (৫৬৮) হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তোমরা উহা অপব্যয় করিয়া এবং তাড়াতাড়ি করিয়া ভোগ করিও না। এবং যে ধনী সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়-সঙ্গতভাবে ভোগ করে। অতঃপর, যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ প্রত্যার্পণ কর তখন তাহাদের উপস্থিতিতে (৫৬৯) সাক্ষী রাখ। আসলে আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

সাধারণভাবে এই আয়াতের নীতি-নির্দেশনা অন্যান্য অপরিপক্ক বুদ্ধির লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যাহারা নিজেদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করিতে অক্ষম। উপযুক্ত বয়সেও যাহারা নির্বোধ ও বোকা থাকিয়া যায় এবং যে কারণে তাহারা স্বীয় সম্পত্তির দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বুদ্ধি রাখে না তাহাদের ক্ষেত্রে, এই আয়াতের নির্দেশ রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে, যাহাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া, উহাদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহন করে।

৫৬৬। এতীমের সম্পত্তিকে এখানে "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই জন্য যে, এতীমদের অভিভাবক যেন খুব সাবধানতার সহিত এতীমের সম্পদ খরচ করে এবং নিজের সম্পত্তির মতই ইহাকে লাভজনকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে। "তোমাদের ধন-সম্পদ" অর্থ তোমাদের দায়িত্বে অর্পিত এতীমের সম্পত্তি। ইহার এই অর্থও সম্ভব যে, 'তোমাদের ধন-সম্পদ' বলিতে এতীমের ও অভিভাবকের সম্মিলিত সব সম্পত্তিই বুঝাইয়াছে।

৫৬৭। এতীমেরা যে পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক না হয় এবং নিজেই নিজের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মত বুদ্ধি অর্জন না করে, সে পর্যন্ত কোনও অবস্থাতেই সম্পত্তি তাহাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া উচিত হইবে না।

৫৬৮। এই আয়াত অভিভাবকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে যে, তাহারা যেন তাহাদের দায়িত্বাধীন এতীমদের টাকাকড়ি অপব্যয় না করেন এবং প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়া দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই যদৃচ্ছা খরচ করিয়া ঘাটতি সৃষ্টি না করেন। তবে অভিভাবক যদি নিজে গরীব হন, তাহা হইলে তিনি সম্পত্তি-সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের শ্রম অনুযায়ী, সম্পত্তির উৎপাদন হইতে ন্যায্য ভাতা গ্রহণ করিতে পারেন।

৫৬৯। দায়িত্বাধীন ব্যক্তিকে (এতীমকে) তাহার সম্পত্তি বুঝাইয়া দিবার সময়, মু'মেন ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর উপস্থিতে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

হাদিস শরীফ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

يايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم (بقرة ايت ٢٦٨)

অর্থাৎ হে যাহারা ঈমান এনেছে! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হতে যা তোমরা উপার্জন কর। (আল্ বাকারা : আয়াত-২৬৮)

হাদীস ঃ

عن عائشة رضى الله عنها انهم ذبحوا شاة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما بقى منها قالت ما بقى منها الا كتفها قال بقى كلها غير كتفها (ترمذى)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একটি ছাগল জবাই করা হয়। (বন্টনের পর) হযরত নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ছাগলের কতটুকু (মাংস) অবশিষ্ট আছে? তিনি (আয়েশা-রাঃ) বললেন, শুধু ঘাড়ের অংশটি বাকি আছে। তিনি (সাঃ) বললেন, ঘাড়ের মাংস ছাড়া সবটুকুই অবশিষ্ট আছে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা :—ইসলাম মানবতার পতাকাবাহক, মানবতার মান উঁচু করতে ও তার সংরক্ষণের প্রতিটি ক্ষেত্রকে জগতের সামনে উন্মোচন করে শিক্ষা দিয়েছে যে, মানবতার সেবাই খোদার সন্তুষ্টি বয়ে আনতে পারে। ইসলাম প্রতিটি নেকীকে খোদার ভয় বা তাকওয়াকে সামনে রেখে করতে বলে। তাই যে সকল নেকী খোদার জন্যে করা হয়ে থাকে তা কখনও বিফলে যাবে না। এ সকল নেকীর মধ্যে যা মানবতার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত তা হলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় মালী কুরবানী করা। খোদাতা'লা কারও মুখাপেক্ষী নন তবুও তিনি বলেন যে, তাঁর সন্তুষ্টি এতেই যে, আমরা যেন তাঁর রাস্তায় খরচ করি। বস্তুতঃ এ সকল খরচকৃত বিছুই খোদার নিকট যায় না বরং খোদা নিয়ৎকে দেখে থাকেন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় যা কিছু খরচ করা হয় বস্তুতঃ তা মানবতার জন্যই। আজ আমরা যে খোদার রাস্তায় মালী কুরবানী করছি একটু ভেবে দেখুন তা মানবতার কীভাবে কাজে লাগছে। অধঃপতিত মানুষকে খোদার নেক বান্দায় পরিণত করা হচ্ছে, স্কুল কলেজ হাসপাতাল দ্বারা মানুষের সেবা করা হচ্ছে। এতীম, বিধবা, বৃদ্ধ, দরিদ্র ব্যক্তিদের দুঃখ মোচন করা হচ্ছে।

কুরআন নির্দেশ দিচ্ছে। যা তোমরা উপার্জন কর তা হতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় অবশ্য খরচ কর।

(অবশিষ্টাংশ ৪র্থ পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

'খাতেমা বিল খায়্র'—শুভ পরিণতির বিষয়টি এমন যে, ইহা বস্তুতঃ একটি কণ্টকাকীর্ণ পথ। যখন মানুষ দুনিয়াতে পদার্পণ করে তখন কিছুকাল তার অচৈতন্য অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়। এই অচৈতন্য কালটি সেই কাল বুঝায় যখন সে শিশু অবস্থায় থাকে এবং দুনিয়া ও ইহার হালহকীকত সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান থাকে না। অতঃপর যখন তার চেতনা সঞ্চার হয় তখন তার উপর এমন কালও আসে যখন সে অবশ্য অচৈতন্য হয় না যেভাবে শিশুকালে হয়, কিন্তু যৌবন কালের এক প্রকার মত্ততা থাকে যা সচেতনার দিনেও অচেতনা সৃষ্টি করে রাখে এবং কিছু এমনভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায় যে, নাফ্সে আম্মারা (পুনঃপুনঃ মন্দ কাজের আদেশকারী আত্মা) প্রাধান্য বিস্তার করে। অতঃপর যখন জ্ঞান অর্জন করার পর পুনরায় অজ্ঞানতা ভর করে এবং ইন্দ্রিয় ও অপরাপর দৈহিক শক্তিতে বিকৃতি ঘটতে থাকে, এটা হলো বার্দ্ধক্যকাল। অনেক লোক সেই সময়ে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও বোধশূন্য হয়ে পড়ে এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তি অকেজো হয়ে পড়ে। অনেক লোকের উন্মাদনার উপসর্গ সৃষ্টি হয়। এমন অনেক পরিবার রয়েছে যে, ষাট বা সত্তর বৎসর বয়সের পরে তাদের পরিবারের সদস্যদের বোধ শক্তিতে বিকার ঘটে যায়।

মোট কথা, যদি এইরূপ না-ও হয়, তথাপি দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের দুর্বলতা ও বিলুপ্তির কারণে সচেতন মানুষ অচেতন হয়ে পড়ে, এবং দুর্বলতা ও জরাজীর্ণতার প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। মানুষের বয়স এই তিন কালেই বিভক্ত এবং এই তিন কালই বিপজ্জনক এবং সমস্যা ও জটিলতায় বিপন্ন। অতএব, অনুমান কর এবং চিন্তা কর যে, খাতেমা বিল্ খায়্র এর পথে কত রকমের সমস্যা রয়েছে। (মলফুযাত ৪র্থ খঃ, ১৯৭ পৃঃ)

(৩য় পাতার পর)

খোদার রসূল (সাঃ) কী সুন্দরভাবে খোদার রাস্তায় খরচ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন যে, যা আছে তার কোন অস্তিত্ব নেই কিন্তু যা খোদার জন্যে খরচ করেছো তা গোটাই অবশিষ্ট আছে।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন তাঁর রাস্তায় বেশী বেশী মালী কুরবানী করতে পারি, আমীন।

হাকিকাতুল ওহী

মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

প্রতিশ্রুত মসীহ দাজ্জালের মোকাবেলায় খানা-কা'বা প্রদক্ষিণ করিবেন, অর্থাৎ দাজ্জালও খানা-কা'বা প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রতিশ্রুত মসীহও করিবেন ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। ইহা দ্বারা বাহ্যিক প্রদক্ষিণ বুঝায় না। নতুবা মানিতে হইবে যে, দাজ্জাল খানা-কা'বায় প্রবেশ করিবে বা মুসলমান হইয়া যাইবে এই উভয় কথাই হাদীসের মূল বক্তব্যের বিরোধী। অতএব এই হাদীস ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যে ব্যাখ্যা খোদা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এই যে, শেষ যুগে একটি দলের উদ্ভব হইবে, যাহাদের নাম দাজ্জাল। তাহারা ইসলামের কঠোর দুশমন হইবে এবং ইসলামকে বিনাশ করিবার জন্য উহার কেন্দ্র খানা কা'বার চতুর্দিকে চোরের ন্যায় প্রদক্ষিণ করিবে, যাহাতে ইসলামের ইমারত সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেওয়া যায়। তাহাদের মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত মসীহও ইসলামের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করিবেন, যাহার রূপক আকার হইল, খানা কা'বা। এই চোরকে পাকড়াও করাই হইল প্রতিশ্রুত মসীহের এই প্রদক্ষিণের উদ্দেশ্য। এই চোরই হইল দাজ্জাল। এই চোরের অন্যায় হস্তক্ষেপ হইতে ইসলামের কেন্দ্রকে রক্ষা করাই প্রতিশ্রুত মসীহের উদ্দেশ্য। সকলের জানা আছে যে, রাত্রি বেলায় চোরও গৃহ প্রদক্ষিণ করে এবং চৌকিদারও প্রদক্ষিণ করে। চোরের প্রদক্ষিণের লক্ষ্য হইল ঘরে সিঁদ কাটা ও ঘরের লোকদের ক্ষতি করা এবং চৌকিদারের প্রদক্ষিণের লক্ষ্য হইল চোরকে পাকড়াও করা এবং তাহাকে কঠোর শাস্তির কারাগারে ঢুকাইয়া দেওয়া যাহাতে তাহার অন্যায় কর্ম হইতে মানুষ শান্তি লাভ করে। অতএব এই হাদীসে এই মোকাবেলার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, শেষ যুগে যে চোরকে দাজ্জাল নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে সে ইসলামের ইমারতকে বিধ্বস্ত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবে *

---

* টীকাঃ—খোদাতা'লা সূরা ফাতেহায় আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় দেখানো হইয়াছে তাহারা শেষ যুগের পথভ্রষ্ট পাদরী, যাহারা হযরত ঈসার আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছে। কেননা, তিনি উক্ত সূরায় এই দোহাই শিখাইয়াছেন, আমরা খোদার নিকট চাই আমরা যেন এইরূপ ইহুদী না হইয়া যাই যাহাদের উপর হযরত ঈসার নাফরমানী ও শত্রুতার দরুন ক্রোধ নাযেল হইয়াছিল এবং না এইরূপ

(টিকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায় দেখুন)

এবং প্রতিশ্রুত মসীহও ইসলামের সেবায় নিজের শ্লোগান আকাশ পর্যন্ত পৌঁছাইবেন। সকল ফেরেশ্‌তা তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবে যাহাতে এই শেষ সংগ্রামে তাঁহার বিজয় হয়। তিনি না ক্লান্ত হইবেন, না শ্রান্ত হইবেন, এবং না তিনি আলস্য করিবেন। ঐ চোরকে পাকড়াও করার জন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন। যখন তাঁহার সকরুণ দোয়া চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়া যাইবে তখন খোদা তাঁহার হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিবেন যে, ইসলামের জন্য তিনি কতখানি বিগলিত হইয়াছেন। তখন যে কাজ পৃথিবী (অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ —অনুবাদক) করিতে পারে নাই তাহা আকাশ (আকাশের ফেরেশ্‌তারা—অনুবাদক) করিবে এবং যে বিজয় মানুষের হাতে হইতে পারে নাই তাহা ফেরেশ্‌তাদের হাত দ্বারা সম্পন্ন করা হইবে।

এই মসীহের শেষ দিনগুলিতে ভয়ঙ্কর বিপদাবলী অবতীর্ণ হইবে এবং গোটা পৃথিবী হইতে শান্তি চলিয়া যাইতে থাকিবে। এই সকল বিপদ কেবল এই মসীহের দোয়ার ফলে অবতীর্ণ হইবে। এই সকল নিদর্শনের পর তাঁহার বিজয় হইবে। ঐ ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কেই রূপকের বেশে লেখা হইয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ তাহাদের কাঁধে চড়িয়া অবতীর্ণ হইবেন। আজ কে ধারণা করিতে পারে যে, এই দাজ্জালী ফেতনা, যাহা শেষ যুগের বিভ্রান্ত পাদ্রীদের ষড়যন্ত্রকে বুঝায়, তাহা মানবীয় প্রচেষ্টায় দূর হইতে পারে? কখনো নহে। বরং আকাশের খোদা স্বয়ং এই ফেতনা দূর করিবেন। তিনি বিদ্যুতের ন্যায় পতিত হইবেন, তুফানের ন্যায় আসিবেন, এবং ভয়ঙ্কর ধূলি-ঝড়ের ন্যায় পৃথিবীকে নাড়াইয়া দিবেন। কেননা, তাঁহার ক্রোধের সময় আসিয়া গিয়াছে। তিনি পরমুখাপেক্ষী নহেন। প্রাকৃতিক পাথরের আগুন মানুষের আঘাতের মুখাপেক্ষী। আহা। কী কঠিন কাজ। আহা! কী কঠিন কাজ। আমাদিগকে একটি কোরবানী দিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঐ কোরবানী সম্পাদন করিব ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রুশ ভঙ্গ হইবে না। এইরূপ কোরবানী যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন নবী সম্পাদনা করিয়াছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার বিজয় হয় নাই। এই কোর-

---

* খৃষ্টান হইয়া যাই যাহারা হযরত ঈসার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে খোদা বানাইয়া দিয়াছিল এবং এইরূপ একটি মিথ্যা অবলম্বন করিয়া যাহা সকল মিথ্যার চাইতে বড় মিথ্যা এবং ইহার সমর্থনে সীমাতিরিক্ত প্রতারণা ও চাতুর্য্য প্রয়োগ করিয়াছে। এই জন্য আকাশে তাহাদের নাম দাজ্জাল রাখা হইয়াছে। যদি অন্য কোন দাজ্জাল হইত তবে এই আয়াতে তাহার নিকট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করা জরুরী ছিল। অর্থাৎ সূরা ফাতেহায় وَلَا الضَّالِّيْنَ এর পরিবর্তে وَلَا الدَّجَّال হওয়া উচিত ছিল। ঘটনা প্রবাহ এই অর্থই প্রকাশ করিয়াছে। কেননা, যে শেষ ফেতনা সম্পর্কে ভয় দেখানো হইয়াছিল, যুগ সেই ফেতনাই পেশ করিয়াছে, যাহা ত্রিত্ববাদের ফেতনা।

বানীর প্রতিই এই আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে : واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (সূরা ইব্রাহীম—আয়াত ১৬)। অর্থাৎ নবীগণ নিজদিগকে মোজাহেদার আগুনে নিক্ষেপ করিয়া বিজয় চাহিলেন। তারপর কি হইল? প্রত্যেক উদ্ধত যালেম বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গেল। ইহার প্রতিই নিম্নোক্ত কবিতায় ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

تا دل مرد خدا نامد بدرد ہیچ قومے را خدا رسوا نکرد

ক্রুশভঙ্গের অর্থ ক্রুশের কাঠ বা সোনা রূপার ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে বুঝা এক মারাত্মক ভুল। এই ধরনের ক্রুশ তো ইসলামী যুদ্ধসমূহে সর্বদাই ভাঙ্গা হইয়াছে। বরং ইহার অর্থ এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ক্রুশীয় মতবাদকে খণ্ডন করিবেন এবং ইহার পর পৃথিবীতে ক্রুশীয় মতবাদ লালিত হইবে না। ক্রুশীয় মতবাদ এইরূপে খণ্ডিত হইবে যে, ইহার পর কেয়ামত পর্যন্ত ইহার চিহ্ন থাকিবে না। মানুষের হাত ইহা ভাঙ্গিবে না। বরং সকল কুদরতের মালিক ঐ খোদা, যিনি এই ফেতনাকে যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেভাবেই তিনি ইহাকে বিনাশ করিবেন। তাঁহার চক্ষু সকলকে দেখিতেছে এবং প্রত্যেক সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে আছে। তিনি অন্যকে এই সম্মান দিবেন না। কিন্তু তাঁহার হাতের বানানো মসীহ এই মর্যাদা লাভ করিবেন। যাহাকে খোদা সম্মান দেন, তাহাকে কেহ হতমান করিতে পারে না। ঐ মসীহকে একটি বড় কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। কাজেই ঐ কাজ তাঁহার হাত দ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাঁহার অগ্রগতি ক্রুশের বিলুপ্তির কারণ হইবে। ক্রুশীয় মতবাদের আয়ু তাঁহার আগমনে পূর্ণ হইয়া যাইবে। লোকদের ধারণা আপনাআপনি ক্রুশীয় মতবাদ হইতে বিমুখ হইয়া পড়িতে থাকিবে। যেমনটি আজ কাল ইউরোপে হইতেছে এবং যেমনটি প্রতীয়মান হইতেছে যে, আজকাল খৃষ্ট ধর্মের কাজ কেবল বেতনভোগী পাদ্রীরা চালাইতেছে। বিদ্বান ব্যক্তিগণ এই মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন। অতএব ইহা এক বাতাস, যাহা ক্রুশীয় মতবাদের প্রতিকূলে ইউরোপে চলিতে শুরু করিয়াছে। এই বাতাসের বেগ প্রত্যহ তীব্রতর হইয়া পড়িতেছে। ইহাই প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের প্রভাব। কেননা, ঐ দুই ফেরেশ্‌তাই প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে অবতরণকারী ছিলেন। তাঁহারা ক্রুশীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন এবং পৃথিবী অন্ধকার হইতে আলোর দিকে আসিতেছে। দাজ্জালী যাদু প্রকাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ার সময় নিকটবর্তী। কেননা, ইহার আয়ু পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শূকর বধের ভবিষ্যদ্বাণী এক নোংরা ও অশ্লীলভাষী দুশমনকে পরাভূত করার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে এবং ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, এইরূপ দুশমন প্রতিশ্রুত মসীহের দোয়ায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

প্রতিশ্রুত মসীহের সন্তান হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, খোদা তাঁহার ঔরষে এইরূপ এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিবেন, যেমন আমার কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি দাজ্জালকে বধ করিবেন—এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ এই যে, তাঁহার আগমনে দাজ্জালী ফেৎনা পতনোন্মুখ হইয়া যাইবে এবং আপনা আপনি হ্রাস পাইতে শুরু করিবে ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের হৃদয় তওহীদের (একত্ববাদের) দিকে ঘুরিয়া যাইবে। প্রকাশ থাকে যে, দাজ্জাল ঐ দলকে বলা হয় যাহারা মিথ্যার সমর্থক এবং ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার দ্বারা কাজ করিবে। দ্বিতীয়টি হইল এই যে, দাজ্জাল শয়তানের নাম, যে প্রতিটি মিথ্যা ও বিপর্যয়ের পিতা। অতএব বধ করার অর্থ এই যে, এই শয়তানী ফেতনার এইভাবে মূলোৎপাটন হইবে যে, কেয়ামত পর্যন্ত কখনো আর ইহার বিকাশ ঘটিবে না, যেন এই শেষ সংগ্রামে শয়তানকে বধ করা হইবে।

প্রতিশ্রুত মসীহের মৃত্যুর পর তাঁহাকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কবরে সমাহিত করা হইবে—এই ভবিষ্যদ্বাণীর এই অর্থ করা যে, নাউযুবিল্লাহ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কবর খনন করা হইবে। ইহা বাহ্যিক ধারণা-পোষণকারী লোকদের ভ্রান্তি, যাহা অসৌজন্যতা ও বেয়াদবীতে পরিপূর্ণ। বরং ইহার অর্থ এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নৈকট্যের দিক হইতে প্রতিশ্রুত মসীহের মর্যাদা এতখানি হইবে যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নৈকট্যের মর্যাদা লাভ করিবেন এবং তাঁহার আত্মা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আত্মার সহিত মিলিত হইবে, যেন তাঁহারা উভয়ে একই কবরে আছেন। প্রকৃত অর্থ ইহাই। যাহার ইচ্ছা সে অন্য অর্থ করুক। আধ্যাত্মিক লোকেরা জানে যে, মৃত্যুর পর দৈহিক নৈকট্য কোন তাৎপর্য বহন করে না। বরং যাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক নৈকট্যে থাকেন তাহাদের আত্মাকে তাঁহার নিকটবর্তী করা হয়, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی (সূরা আল ফজর, আয়াত ৩০-৩১)। (অর্থ: সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর, এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে—অনুবাদক)

তাঁহাকে হত্যা করা হইবে না—এই ভবিষ্যদ্বাণী এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, খাতামাল খোলাফার নিহত হওয়া ইসলামের অবমাননার কারণ হইবে। এই কারণেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নিহিত হওয়া হইতে রক্ষা করা হইয়াছে।

১৩৭নং নিদর্শন: এই আজীমুশ্বান নিদর্শনটি লেখরামের মোবাহালা সম্পর্কিত। উল্লেখ থাকে যে, আমি সুরমা চশমায়ে আরিয়ার পরিশিষ্টে কোন কোন আর্য ভদ্রলোককে মোবাহালার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলাম এবং লিখিয়াছিলাম যে, বেদের প্রতি যে শিক্ষা আরোপ করা হয় তাহা সঠিক নহে এবং আর্য সুধীবৃন্দ কুরআন শরীফের প্রতি যে মিথ্যারোপ করেন ঐ মিথ্যারোপে তাহারা মিথ্যাবাদী। যদি তাহাদের এই দাবী হয় যে, বেদের প্রতি যে শিক্ষা আরোপ করা হইয়া থাকে তাহা সত্য এবং/অথবা নাউযুবিল্লাহ কুরআন

শরীক আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নহে তবে তাহারা আমার সহিত মোবাহালা করুন এবং লেখা হইয়াছিল যে, সর্বপ্রথমে মোবাহালা করিবেন লালা মুরলী ধর সাহেব, * যাহার সহিত হুশিয়ারপুরে বিতর্ক হইয়াছিল। ইহার পর মোবাহালার জন্য আমার সম্বোধিত ব্যক্তি লাহোরের আর্য সমাজের সেক্রেটারী লালা জীবনদাস। অতঃপর আর্যদের মধ্য হইতে অন্য কোন সুধীকে সম্বোধন করা যাইতেছে, যাহাকে সম্মানিত ও জ্ঞানী বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

আমার এই লেখা পণ্ডিত লেখরাম তাহার পুস্তক খব্‌তে আহমদীয়ার ১৮৮৮ সালে প্রকাশ করিয়াছি।. এই পুস্তকের পরিশিষ্টে এই তারিখ লিপিবদ্ধ আছে। সে আমার সহিত মোবাহালা করিল। বস্তুতঃ সে মোবাহালার জন্য তাহার পুস্তক খব্‌তে আহমদীয়ার ৩৪৪ পৃষ্ঠার ভূমিকারূপে নিম্নরূপ বক্তব্য লেখে :—

যেহেতু আমাদের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত মাষ্টার মুরলী ধর সাহেবের ও মুন্সী জীবন দাস সাহেবের সরকারী কাজের চাপের দরুন সময়ের অভাব, তাই এই কারণে এবং তাহাদের নির্দেশে এই অধম এই দায়িত্বও নিজ স্কন্ধে লইলাম। অতএব কোন জ্ঞানী ব্যক্তির এই প্রবাদ "মিথ্যাবাদীকে তাহার ঘরে তুলিয়া দিয়া আস" গ্রহণ পূর্বক আমি মির্যা সাহেবের এই শেষ আবেদনও (অর্থাৎ মোবাহালাকে) মঞ্জুর করিতেছি এবং মোবাহালাকে এখানে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

মোবাহালার বিষয়-বস্তু

আমি বিনীত লেখরাম, পিতা পণ্ডিত তারা সিং শরমা সাহেব, 'তাকযিবে বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের প্রণেতা, এই সত্য স্বীকৃতি জানাইতেছি এবং সুস্থ শরীরে ও সজ্ঞানে বলিতেছি যে, আমি সুরমা চশমায়ে আরিয়া গ্রন্থ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া নিয়াছি। একবার নহে, বরং কয়েকবার ইহার দলিল প্রমাণাদি উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছি, বরং উহার যুক্তিতর্কসমূহ উক্ত গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। মির্যা সাহেবের দলিল প্রমাণাদি আমার হৃদয়ে কোন প্রভাবই বিস্তার করে নাই এবং না এই সকল দলিল-প্রমাণে সত্যপরায়ণতা আছে। আমি আমার জগতপিতা পরমেশ্বরকে সাক্ষী জানিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, পবিত্র চতুর্বেদ হেদায়াত-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার উপর আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আমার আত্মা ও সকল আত্মা কখনো সম্পূর্ণরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না, না কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং না কখনো হইবে। (ক্রমশঃ)

---

* টীকা :—বলা বাহুল্য, মোবাহালার দুই চারটি লাইন লেখার জন্য কোন অবসরের প্রয়োজন ছিল না। মোবাহালার সার কথাতো কেবল এই বাক্যই ছিল যে, নিজের ও দ্বিতীয় পক্ষের নাম লইয়া খোদাতা'লার নিকট এই দোয়া করিতে হইবে যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং মাষ্টার মুরলী ধর ও মুন্সী জীবন দাসের অবসর কি এত কম ছিল যে, এই দুইটি লাইনও তাহারা লিখিতে পারিল না? বরং আসল সত্য এই যে, তাহারা দুইজনেই সত্যের মোকাবেলায় ভীত হইয়াছিল। কিন্তু লেখরাম নিজের দুর্ভাগের দরুন বদ রাগী ও অন্ধ ছিল। সে নিজের স্বভাবজাত বদ-রাগের দরুন তাহাদের বিপদ নিজের ঘাড়ে নিয়া নিল। অবশেষে মোবাহালার পর ১৮৯৭ সালের ৬ই মার্চ সোমবার দিন সে এই পৃথিবী হইতে বিদায় নিল।

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

(৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৬ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত)

অনুবাদঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

ওয়াক্ফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার ২৬৮-২৬৯তম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন :

يايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه - واعلموا ان الله غنى حميد ٥

الشيطن يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء - والله يعدكم مغفرة منه وفضلا - والله واسع عليم ٥

[বঙ্গানুবাদ : "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হইতে যাহা তোমরা উপার্জন কর, এবং উহা হইতেও যাহা আমরা তোমাদের জন্য যমীন হইতে উৎপন্ন করি; এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করিও না, যাহা হইতে তোমরা খরচ কর বটে, কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করিয়া আদৌ উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহ। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য।

শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং সে তোমাদিগকে অশ্লীলতার আদেশ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ক্ষমা এবং ফযলের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী"]

অতঃপর হুযূর বলেন : উক্ত আয়াতসমূহে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানব-প্রকৃতি ও স্বভাব নিহিত একটি দুর্বলতাকে সামনে রেখে অতি হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে সাবধান করা হয়েছে যে, খোদার পথে অর্থ দান করার সময় তোমরা নিজেদের ঐ দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রেখো এবং তদ্দরুন পদস্খলিত হয়ো না। তোমাদের জানা উচিত, যা কিছু তোমরা খরচ করছো, তা কী উদ্দেশ্যে করছো, কার হুযূরে পেশ করছো—এর আদব-কায়েদা ও যথাযথ রীতিনীতিকে (তোমাদের পক্ষে) সর্বদা

দৃষ্টিগোচরে রাখা অপরিহার্য। উক্ত বিবরণটি এরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেখ, যখন তোমরা খোদার পথে দান কর তখন হে ঈমানদারগণ! তোমরা 'তাইয়েবাত' (উৎকৃষ্ট বস্তু) থেকে খরচ করো। যা কিছু উপার্জন কর তাথেকে উত্তম জিনিস পেশ করো। যেমন, তোমরা একে অন্যকে যখন তোহ্ফা পেশ কর, তখন যার সাথে যত বেশী সম্পর্ক থাকে যার জন্য যত বেশী সম্মান ও মর্যাদাবোধ থাকে, তখন তার জন্যে তোহ্ফা নির্বাচনে মানুষ তার মালিকানাধীন সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট বস্তু নির্বাচন করে থাকে। যদি সে বাগানের মালিক হয়, তাহলে তোহ্ফার জন্যে সে তার বাগানের সর্বোত্তম ফলগুলো বেছে নিবে। ব্যবসায়ীদের মত এরূপ করে না যে, পচা ফলগুলো বেছে নিয়ে উপরিভাগে দু'চারটা ভাল ফল রেখে দেয়, যাতে ভাল জিনিস বলে (ক্রেতাকর্তৃক) গৃহীত হয়। (বিক্রেতা) দাম পেয়ে যায়, যদিও পরে জানা যায় যে, এতো অত্যন্ত খারাপ জিনিসের সওদা করা হয়েছিল। তবে আল্লাহ্র সাথে তো ধোঁকাবাজী করা যায় না। কিন্তু দুনিয়াতেও মানুষ নিজেদের ভালোবাসা ও সম্পর্কাবলীর কদর করে থাকে। নিজেদের প্রিয়দের সাথে ধোঁকাবাজী করে না। ব্যবসায়ীরা করতে পারে। প্রেমিকরা করতে পারে না। অতএব, আল্লাহ্ বলেছেন, আমার সাথে তো তোমাদের একটা ভালোবাসার (সম্পর্ক ভিত্তিক) সওদা। দ্বিতীয়তঃ আমি তোমাদেরকে দান করেছি। কাজেই আমি যখন দিয়েছি, তখন আবার তোমরা যদি (আমারই দেয়া সম্পদ থেকে) খারাপ জিনিস দাও, তাহলে তোমাদের অনেক বিরাট ক্ষতি হবে। একে তো তোমাদের তোহ্ফা অগ্রাহ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ তোমরা আমাকে এই নমুনা প্রদর্শন করবে যে, তোমরা তো খারাপ জিনিস দিয়ে থাক। তার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরও (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) খারাপ (প্রতিদান) পাওয়া উচিত। তদুপরি, ইহ্সান উপেক্ষাকারী তো পরিণামে কিছুই পায় না। খোদাতা'লা আদৌ নিজের প্রয়োজন মিটাবার জন্যে তো চান নি। তিনি তো আমাদেরই প্রয়োজন মিটাবার উদ্দেশ্যে চেয়েছেন। এ প্রয়োজন দু'ভাবে পূরণ হয়ে থাকে। এক, আত্মশুদ্ধি লাভ। দুই, অনুগ্রহের বদলা চুকাবার যে আকাঙ্খা মানব-প্রকৃতিতে নিহিত আছে উহা যাতে কিছুটা পূরা করা যায়। অনেক সময় ঈদ উপলক্ষে সন্তানরাও মা-বাবার জন্যে তোহ্ফা নিয়ে আসে। অথচ সবকিছু তাঁরাই দিয়ে থাকেন। তাঁরাই সব রকম অনুদান ও মাসিক ভাতা ও খরচ-পাতি যোগান দেন। তাঁরাই ভরণ-পোষণ করে থাকেন। তাঁদেরই গৃহে তারা লালিত-পালিত হয়। কিন্তু যখন ঈদ অথবা এরকমই অন্য কোন উপলক্ষ্যে তারা তোহ্ফা (উপহার) পেশ করে, তখন মা-বাবা আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে পড়েন। এই তোহ্ফা যা তারা প্রীতিভরে দিয়ে থাকে, স্বযত্নে সাজিয়ে পেশ করে থাকে, তা গ্রহণ করে মা-বাবা এত আনন্দ অনুভব করেন যেন দুনিয়া-জাহানের কোন নেয়ামত তারা পেয়ে গেছেন। অতএব, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার ধারা ও রীতি-নীতি ভিন্ন-

ভর হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ্‌তা'লা বলছেন, আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আবার তোমাদের কাছে চাই। অতএব, এ হচ্ছে ভালোবাসার একটা আদান-প্রদান ও বহিঃপ্রকাশ, যাতে ভালোবাসা বিনিময়ের রীতি-নীতি তোমাদের রপ্ত হয়। যাতে তোমাদেরও এই আকাঙ্খা পূর্ণ হয়—যিনি তোমাদেরকে সবকিছু দিয়েছেন, তাঁকে যাতে তোমরাও কিছু দিতে পার। যদি খোদাতা'লা এই ব্যবস্থা প্রবর্তন না করতেন, তাহলে মানুষের পক্ষে তার প্রকৃতি ও স্বভাবে যে আকাঙ্খা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে তা কখনও কোন দিক দিয়েও পূরণ হতে পারতো না। সর্বতঃ অপূর্ণ থেকে যেতো। কিন্তু মা-বাবার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ যখন ওরূপ করে দেখায় এবং স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করে থাক, তখন খোদার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনুরূপ (আল্লাহ্‌র পথে অর্থ দানের) একটা ব্যবস্থা যদি না থাকতো, তাহলে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় বৃথা হয়ে যেতো। উহা খোদার দরবারে গৃহীত হতে পারতো না।

উক্ত বিষয়টিই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা এক উপমা উপস্থাপনের দ্বারা বর্ণনা করেছেন: "যা তোমরা উপার্জন কর উহার থেকে এবং যা আমরা জমীন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি উহার মধ্য থেকে উত্তম জিনিষ তাঁর উদ্দেশ্য পেশ করো।"

এছাড়া অন্যান্য আয়াতে এবং এ আয়াতটির বাচনভঙ্গীতে সামান্য পার্থক্য রেখে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে বলেছেন, "ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউন্‌ফিকুন"—যা কিছুই তাদেরকে আমরা দান করি উহার মধ্য থেকে তারা খরচ করে।" আর এখানে বলেন: "মিন তাইয়েবাতে মা কাসাবতুম"—যা তোমরা উপার্জন কর উহার মধ্য থেকে উত্তম জিনিস দান কর। ইহা এজন্যে যাতে মানুষের বিবেকের পিপাসা মিটে। যাতে সাময়িকভাবে তার মনে যে ধারণার উদয় হয় যে, সে যা উপার্জন করেছে উহা থেকে সে দিচ্ছে, যেন সে নিজের গৃহ থেকে এনে দিচ্ছে—এই অজ্ঞতাপূর্ণ ধারণার অপনোদনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তা'লা একই সাথে বলে দিয়েছেন যে, "জমি থেকে যা উৎপাদিত হয় তা সবই আমি উৎপাদন করি।" সব দানের উৎস আমিই। আমা থেকেই উহার সূচনা। তথাপি পরিশ্রম দিয়ে যেহেতু তোমরা অংশ নিয়েছ। শ্রমের দ্বারা উহাতে অংশীদার হয়েছ। কাজেই আমি বলছি, নিজেদের পরিশ্রম (লব্ধ) বলেই ধরে নাও। তবে উহার মধ্যে যা উত্তম জিনিস তা আমার সমীপে উপহারস্বরূপ পেশ কর। হ্যাঁ, এমনটি করো না—"ওয়া লা তায়াম্মামুল খাবীসা"—যা নিরস ও নোংরা, তা আমার নামে (দেওয়ার উদ্দেশ্যে) বের কর না। যদি কর, তাহলে তোমাদের অন্তরের নোংরামিই প্রকাশ পাবে এবং কোন নোংরা জিনিস খোদার সকাশে পৌঁছুতে পারে না। উহা যদি তোমাদের কাছে অনভিপ্রেত বোঝা বা জরিমানা স্বরূপই হয়ে থাকে, তাহলে

নিকৃষ্ট ধরনের বোঝা তোমাদের উপর চেপে গেলো। এরূপ আর্থিক কুরবানীকে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। উহা আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত না হওয়ার আলামত বলে দিলেন এই বলে যে, যা তোমরা খরচ কর, উহা যদি তোমাদেরকে দেয়া হয়, তাহলে লজ্জায় তোমাদের চোখ নত হয়ে যায়। "লা তায়াম্মামুল খাবীস মিনহু তুনফিকুনা"—ঐ সব নোংরা ও নিরস জিনিস আল্লাহ্‌র রাস্তায় দানস্বরূপ পেশ করো না। "ওয়া লাস্‌তুম আখেযিহে"—যখন উহা তোমাদেরকে গ্রহণ করতে হয় তখন নিজেরা উহা গ্রহণ করতো পার না। "ইল্লা আন তুগ্‌মিযু ফীহে"—ইহা ব্যতীত যে, চোখ নত করে, লজ্জার মাথা খেয়ে, অস্থির চিত্তে, বাধ্যতামূলকভাবে উহা গ্রহণ কর। এতদসত্ত্বেও অত্যন্ত অপমানিত বোধ কর। "ওয়া'লামু আন্নাল্লাহা গানীউন হামীদ"—জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ তো হচ্ছেন পরম প্রাচুর্যশালী, অ-পরমুখাপেক্ষী এবং পরম প্রশংসাময়। 'গনী' হওয়ার দিক দিয়ে তোমাদেরকে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। 'হামীদ' হওয়ার দিক দিয়ে তাঁর কাছে নোংরা ও নিরস জিনিস পৌঁছুতে পারে না। যিনি প্রশংসার অধিকারী, কেউ যদি তাঁকে নোংরা জিনিস দেয় তাহলে সেটা তো তাঁর কাছে গৃহীত হতে পারে না। যা প্রশংসনীয় বস্তু, কেবল উহাই তাঁর নিকট পৌঁছুতে পারে। নইলে, খোদার সাথে তোমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বরং ছিন্ন হয়ে যাবে।

এরপর আরেকটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী সূক্ষ্ম বিষয় আল্লাহ্‌তা'লা বর্ণনা করেছেন এই যে, তোমরা যে ভাল জিনিস পেশ করা থেকে বিরত থাক এর পিছনে কোন ব্যাপার আছে। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, শয়তান তোমাদেরকে এরূপ এক পথে তুলে দেয় যে-পথে পরিচালিত হয়ে তোমরা খোদার পথে ব্যয় করা থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে তথাপি তোমাদের বাসনা-কামনা পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। তোমাদের প্রবৃত্তির পিপাসার আগুন কখনও নিভবে না এবং তোমরা ক্রমাগত নিকৃষ্টতর অবস্থার শিকার হতে থাকবে।

"আশ্‌-শাইতানু ইয়াইদুকুমুল ফাক্‌রা"—খোদার রাস্তায় কার্পণ্যকারীদের (যাত্রার) সূচনা হয় এ বিষয়টি থেকে যে, শয়তান তাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায়। সে বলে যে, "তোমরা গরীব হয়ে যাবে। অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে। যা কিছু আয় হয় তা যদি তোমরা দিতেই থাক, তাহ'লে থাকবে কী তোমাদের হাতে? তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে কী করে? পরিবার-পরিজনের হক্‌-অধিকার কী করে পূরণ করবে? দৈনন্দিন জীবনে (সোসাইটিতে) যে-টুকু সম্মানের আসন তৈরী করে রেখেছ উহার চাহিদাগুলো কী করে মিটাবে?" অতএব শয়তান দারিদ্রের ভয় দেখায়। কিন্তু এই ভীতিগ্রস্থরা এ কথাটি ভুলে যায় যে, শয়তান তাদেরকে কবেইবা দান করেছিল যে, সে তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাদেরকে উপদেশাবলী দিচ্ছে। দিয়ে তো ছিলেন খোদাতা'লা। আর যাঁকে

(যাঁর রাস্তায়) তারা দিচ্ছে (বা ব্যয় করছে) তিনিই তাদেরকে দিয়েছিলেন। অতএব, দারিদ্রের সওদা হতেই পারে না। ইহা সম্ভবই নয় যে, দাতা গ্রহণ করবেন; এমনভাবে যে, তাঁর ডাকে দানকারীকে তিনি গরীব, অভাবী ও ভিক্ষুক বানিয়ে ছেড়ে দিবেন। যদি এমনটি হবার ছিল, তাহলে দেওয়ার প্রয়োজনই বা কী ছিল? অতএব, এটা এমনই এক অসম্ভব ব্যাপার, যা কোনরূপেই বিবেক-বুদ্ধিতে ধরে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা ভয় পেয়ে যাও। (বলতে হয়) খুব বেশী রকমেরই বোকা তোমরা। (কেননা) শয়তান যার কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের রিযিকের সাথে, তাকে তোমরা ভয় পাচ্ছ! তবে কোন কোন ক্ষেত্রে (রিযিকের সাথে তার) সম্পর্ক তোমরা নিজেরা সৃষ্টি করে নাও যখন অবৈধ (ভাবে) রিযিক উপার্জন করে থাক। তখন অবশ্য শয়তানের দখলদারী তোমাদের উপরে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এখানে আল্লাহ্‌তা'লা অবৈধ রিযিকের কথা তুলেনই নি। বলেছেন, "তাইয়েবাত অর্থাৎ পবিত্র মাল থেকে, যা তোমরা উপার্জন কর।" অতএব, এখানে ঐ শ্রেণীর লোকের কথা বলা হচ্ছে যারা অবৈধ কোন কিছু উপার্জন করছে না। যারা অবৈধ উপার্জনকারী, তাদের কাছে তো আল্লাহ্‌ কখনও চানই না। কবে তিনি বলেছেন যে, তোমাদের হারাম কামাই থেকে আমার নিকট পেশ কর?! সে বিষয় আলোচনার বহির্ভূত। অতএব, যাদেরকে খোদাতা'লা দান করেছেন, শয়তান দান করে নি, তারা বড়ই নির্বোধ (বলে বিবেচিত) হবে, যদি শয়তান কর্তৃক ভয় দেখাবার দরুন তারা ভয় পেয়ে যায় এবং যাদেরকে খোদা দান করেছেন তারা যদি তাঁর রাস্তায় দিতে পশ্চাদপদ হয়। শয়তান সেই সাথে আরও কী প্ররোচনা দেয়? সে দারিদ্রের ভয় দেখানো ব্যতীত অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার উপদেশ দেয়, এটা বস্তুতঃ এক অত্যন্ত গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। 'ফাহ্‌শা' (অশ্লীলতা) হচ্ছে সে জীবন; যেখানে মানুষকে অনেক খরচ করতে হয়। বস্তুতঃ শয়তান যে মিথ্যেবাদী তা এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সে তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখিয়ে এরূপ চাল চালে, এরূপ বাসনা-কামনা উস্কিয়ে দেয়, যা ব্যয়বহুল, যা চরিতার্থ করতে গিয়ে তোমাদেরকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়। তোমাদের জীবনের সাধারণ প্রয়োজনগুলো পূরণ করার পর যা কিছু অবশিষ্ট বাঁচে, তার চেয়ে ঢের খরচ করেও 'ফাহ্‌শা' সম্পর্কিত বাসনাগুলোর নিবৃত্তি হতে পারে না। এর দ্বারাই শয়তানের ধোঁকাবাজির রহস্য এবং এই ধোঁকার ফাঁদে যারা পড়ে, তাদের বিবেক-বুদ্ধির অসারতা সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। যদি শয়তান তোমাদের টাকা-পয়সাই বাড়াতে চায় তাহলে সে তোমাদেরকে 'ফাহ্‌শা'র দিকে কেন ভিড়ায়? কেন বলে যে, অনেক চড়াদামের মটর কার ক্রয় কর, তবেই কিনা মনের স্বাদ মিটবে, তৃপ্তি হবে? কেন বলে যে, উচ্চস্তরের ভোগ ও বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ কর, তবেই কিনা সঠিকভাবে জীবনের সুখ-শান্তি লাভ করবে? এবং একে অন্যের দেখাদেখি অগ্রসর হয়ে এরূপ খরচ-পাতি কর যাতে বাহ্যিক-

ভাবে তোমাদের জাতি বা সমাজে তোমাদের নাক উঁচু থাকে, সম্মান রক্ষা পায়, যদিও বাদবাকি সবই খতম হয়ে যাক। এই যে ফাহ্শা বা বেহায়াপনার শিক্ষা, ইহা প্রমাণ করছে যে, তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শয়তানের কোনও কৌতূহল বা ঔৎসুক্য নেই। সে বরং তোমাদেরকে দুশমনসুলভ কুপ্ররোচনার জালে আবদ্ধ করে মাত্র। এর মোকাবেলায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে কি বলেন? শয়তান তো তোমাদেরকে দারিদ্র ও অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ বলেন: "ওয়া ইয়াইয়েহুকুম মাগফিরাতাম মিনহু ওয়া ফাযলান"—আল্লাহ্তা'লা তোমাদেরকে নিজ পক্ষ থেকে মাগফিরাত (ক্ষমা ও সংরক্ষণ) এবং ফযল প্রদানের ওয়াদা প্রদান করেন। অতএব, আল্লাহ্র রাস্তায় অর্থ দানের একটি সম্পর্ক মাগফিরাতের সাথেও বটে। এবং ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ, যা আল্লাহ্ শেষে বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহের আলোকে যে সব প্রসঙ্গ ও সম্পর্ক আমি বর্ণনা করে এসেছি সেগুলোর অতিরিক্ত বিষয় হচ্ছে এই যে, স্মরণ রাখবে, ওগুলোতো তোমরা পাবেই, উপরন্তু তোমরা এতো গোনাহ্গার যে শুধু পাপ-পুণ্যের মধ্যে যদি পরস্পর মাপ-জোপ করা হয় তাহলে ক্ষমা লাভের সম্ভাবনা খুবই কঠিন ও দুষ্কর। ইহা বাস্তব সত্য যে, পুণ্যগুলো কত এবং পাপের পরিমাণ কত, যদি এতদোভয়ের মাঝে পরিমাপ করা হয়, তাহলে বেশীর ভাগ মানুষই এরূপ যাদের পাপের পাল্লা ভারী বলে প্রতীয়মান হবে এবং পুণ্যের পাল্লা হবে হাল্কা। আল্লাহ্তা'লা বলেন: "মাগফিরাতাম মিনহু ও ফাযলা"। মাগফিরাত ও ফযল-উভয়েরই সাথে আল্লাহ্র রাস্তায় অর্থব্যয়ের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। অতএব তিনি বলেন যে, মাগফিরাতে'র দ্বারা তিনি তোমাদের বোঝা লাঘব করে দিবেন। পাপের যেসব বোঝা রয়েছে সেগুলো হিসেবে ধরবেন না। তদোপরি, 'ফযলে'র দ্বারা পুণ্যের পাল্লা ভারী করে দিবেন। অতএব, উভয় দিকে আল্লাহ্র রাস্তায় অর্থ দানের ফায়দা (কল্যাণ) বিচিত্র উপায়ে পৌঁছুবে। অর্থাৎ একদিকে পাপের পাল্লা লাঘব এবং অন্য দিকে পুণ্যের পাল্লা ভারী। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অন্য সব জিনিস তো তারা পূর্বেই পেয়ে গেছে। তাছাড়া, ফযলের আরেক অর্থ হচ্ছে, ধন-সম্পদেও তিনি বরকত দান করেন। কেননা, 'ফযল' শব্দটি কুরআন করীমে ধন-সম্পদে বরকত ও বৃদ্ধি দানের সাথেও সম্পর্ক-যুক্ত। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বিভিন্ন স্থলে পার্থিব নেয়ামতরাজীর ক্ষেত্রেও এ শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব, দ্বিগুণভাবে আরেক ফায়দাও প্রতিভাত হলো এই যে, তোমাদের ধন-সম্পদও বৃদ্ধি পাবে। কমে যাবে না। শয়তান মিথ্যে বলছে। দারিদ্র ঘটবে না। তাছাড়া, শয়তান 'ফাহ্শা' তথা অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করে, যার দরুন পাপের পাল্লা ভারী হতে থাকে। (আল্লাহ্ বলছেন,) আমরা 'মাগফিরাত' তথা ক্ষমার দিকে তোমাদের আহ্বান করছি। যার দরুন তোমাদের কৃত পাপও মোচন হতে থাকবে। তোমাদের থেকে সরে যেতে থাকবে। শয়তান দারিদ্রের ভয় দেখায়। আমি (আল্লাহ্)

ফযলের প্রতিশ্রুতি দান করি। এবং আমি আমার প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী। শয়তান তার প্রতিশ্রুতিতে মিথ্যেবাদী। এতো পরিষ্কার, এতো প্রাঞ্জল ও বিশদভাবে সবিস্তারে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে আপনারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থব্যয়ের বিষয়-বস্তু কোথাও খুঁজে পাবেন না। এ বিষয়টি কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই অদ্ভুত এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত সৌন্দর্য সহকারে বর্ণিত হয়েছে। যা অন্যান্য বিষয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যতীত আরো কতক হিকমতের বিষয়ও বহন করে। আলোচ্য আয়াতগুলোতেও, যদি আপনারা গভীর মনোনিবেশ করেন, তাহলে এ শিক্ষার কতই না মনোরম দৃশ্য আপনাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে। দুনিয়ার কোনও শিক্ষা যার ধারে কাছেও ভিড়তে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা বলেনঃ "ইউতিল হিকমাতা মাঁই-ইয়াশাউ"—দেখ, খোদা কীরূপ বিপুল হিকমতের বিষয় বর্ণনা করছেন। যাকে চান তাকে তিনি হিকমত দান করেন। আরও বলছেন যে, হিকমত তো ধন-সম্পদের চেয়েও শ্রেয়ঃ এবং হিকমতই হচ্ছে যা ধন-সম্পদ লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। "ওয়া মাই' ইউ'তাল হিকমাতা ফাকাদ উ'তিয়া খাইরান কাসীরা"—যদি (পার্থিব) ধন-সম্পদের পরিবর্তে কেবলমাত্র হিকমতই কাউকে দান করা হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে বিরাট এক সম্পদ তাকে দান করা হয়। তদুপরি, ধন-সম্পদও যদি বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং সেই সাথে হিকমতও, তাহলে তো অগাধ সম্পদের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। এসবই হিকমতের কথা, যা আপনারা শুনলেন। হিকমত সম্পর্কিত আরেকটি বাস্তবসত্য, যা অধুনাযুগে সুস্পষ্টতা প্রতিভাত হয়ে পড়ছে। তা এই যে, আজ যে সব জাতি দুনিয়ার ধন-সম্পদের উপর আধিপত্য লাভ করেছে তারা নিজেদের হিকমতের দ্বারাই করেছে। তারা জ্ঞানরাশির রহস্যাবলীকে রপ্ত করছে। জ্ঞানের অন্তর্নিহিত গোপন তত্ত্বাবলী তারা উদ্‌ঘাটন করছে। এরই ফলশ্রুতিতে সমস্ত ধন-সম্পদ নিজের ভুয়ার তাদের সামনে খুলে দিয়েছে। পক্ষান্তরে বেচারী যেসব জাতি হিকমত বঞ্চিত, তারা হচ্ছে সবাই জাহিল—নিরেট অজ্ঞ জাতি। ধন-সম্পদ তাদের নসীবে জুটে নি। যদিও বা ধনী জাতিবর্গ লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। অতএব, কুরআনী শিক্ষা হিকমতের ধনভাণ্ডারে ভরপুর। "ওয়া মাই' ইউ'তাল হিকমাতা ফাকাদ উতিয়া খাইরান কাসীরা"—তোমাদের মধ্যে যাকেই হেকমত দান করা হবে, তাকে অবশ্যই যেন প্রভূত ধন-সম্পদে ভূষিত করা হলো। "ওয়ামা ইয়াযযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব"—কিন্তু বুদ্ধিমানগণ ব্যতীত অন্য শিখে কে? মুসিবত তো এটাই। এ সবই, হিকমতের কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তথাপি (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করার সময় (বা উপলক্ষ) যখনই উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের মাঝে যারা কৃপণ স্বভাব, তাদের হাতের মুঠো বন্ধাবস্থায়ই থেকে যায়। মুক্ত হস্তে দান করতে তাদের সাহস কুলোবে না। "ওয়ামা ইয়াযযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব"

—বুদ্ধিমানদের ছাড়া কে আছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে? কে আছে, যারা এসব উপদেশবাণীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য রাখে? উক্ত বিষয়-বস্তু পরবর্তী আয়াত-সমূহেও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু আজ আমি কেবল উক্ত আয়াত দু'টিতেই সমাপ্তি টেনে, ওয়াক্‌ফে জাদীদের নব-বর্ষের ঘোষণা করতে চাই।

বস্তুত: আহমদীয়া মুসলিম জামাত সামগ্রিকভাবে যে পরিমাণ, যে ভঙ্গিমায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ব্যয় করে চলেছে, সেদিক দিয়ে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার ইহা এক জলন্ত প্রমাণ, যা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহা যেন দিবসে সূর্য হয়ে দীপ্তিমান হয়। আর রাতে চাঁদ হয়ে আলো বর্ষণ করে। রাত-দিন আহমদীয়া জামাত যে সব (আর্থিক) কুরবানী পেশ করছে, তাতে এরূপ জ্যোতি রয়েছে, যার কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে আমরা খুঁজে পাই না। যদি এরূপ কোনও জামাত থেকে থাকে তাহলে তা আমাদের কেউ দেখিয়ে দিক। আমারা তো এমনটিই দেখেছি, যারা ধর্মের নামে জমিয়ত বা সংগঠনও তৈরী করে, খেদমতও করে, তারা কেবল ততক্ষণ পর্যন্তই করে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সম্পদশালী (দাতা) হাত তাদেরকে দান করতে থাকে। কোনও সরকার সাহায্য ও অনুদান বন্ধ করে দিলে ঐ সব খেদমতও খতম হয়ে যায়। কিন্তু ঐ জামাত যা আল্লাহ্‌র নামে মানব-সেবাও করেছে এবং ধর্মসেবা অর্থাৎ দীনী ও রূহানী মূল্যবোধসমূহেরও সেবা করে যাচ্ছে, ঐ জামাত সারা পৃথিবী জুড়ে মাত্র একটি অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যারা সব রকম সেবা করে এবং তা তারা নিজেরা "ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ"—আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ব্যয়ের দ্বারা করে থাকে। কোন বাহিরের হাত তাদেরকে কানাকড়িও দান করছে না। হ্যাঁ, কেবল আল্লাহ্‌র হাতই তাদেরকে দান করে। তারা যে আল্লাহ্‌র খাতিরে কাজ করে, পবিত্র ও উৎকৃষ্ট মাল দান করে, বা উপার্জন করে উহা খোদারই দান মনে করে খোদার হুযুরে পেশ করে এবং ইহাতে পরম আনন্দ ও স্বাদ অনুভব করে—এর যথার্থতা এভাবেও প্রমাণিত যে, প্রত্যক বছর তাদের কুরবানীকারীগণ ক্রমাগত অগ্রসরমান। যে ব্যক্তি কুরবানী করতে গিয়ে কুণ্ঠা ও কষ্ট অনুভব করে সে তো দু'চার বছর পর্যন্তই চলবে; তারপর ক্লান্ত হয়ে সরে পড়বে। সে বলবে, "যথেষ্ট হয়েছে, যা দিবার দিয়ে দিয়েছি। এখন আর যেন আমার দুয়ারে করাঘাত না করা হয়।" কিন্তু যাদের অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যে-সব নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী পেশ করতে অভ্যস্থ, যদি "সেক্রেটারী মাল" তাদের দুয়ারে করাঘাত করা ছেড়ে দেন, তারা নিজেরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, "আপনার কী হয়েছে যে, আমাদের কাছে চাঁদা নিতে আসলেন না? দেখুন, এভাবে যদি শৈথিল্য করেন, তাহলে আমাদের (চাঁদা দিতে) গাফেলতি হয়ে যেতে পারে। এই (চাঁদার জন্যে রাখা) টাকা অন্য কোথাও খরচ হয়ে যেতে

পারে।" তারপর, যারা উক্তরূপ ব্যক্তিদের চেয়েও অগ্রসরমান তারা ভাবতেও পারেন না যে, যে-টাকা খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে 'ওয়াক্‌ফ' করেছেন উহা অন্য কোথাও খরচ হয়ে যাক। তারা বরং দেখেন যে, কোন টাকা যা তারা কোনও (বিশেষ কাজের) উদ্দেশ্যে তুলে রেখে ছিলেন উহা খোদাতা'লার পথেই খরচ করা যায় কি না। কেননা, বলা তো যায় না, আবার এর তওফীক পাওয়া যায় কিনা। এরূপ অসংখ্য ঘটনা প্রত্যেক বছর সারা বছর ব্যাপীই হতে থাকে এবং অজস্র ধারায় আল্লাহ্‌ তা'লার ঐ ওয়াদা, যা 'ফযলে'র আকারে এই অর্থে রয়েছে যে, তিনি বৃদ্ধিসাধনকারীও বটেন—ইহা বাস্তবায়িত হতে থাকে। প্রায়শঃ এরূপ ঘটনাবলীও সামনে আসতে থাকে, যা দেখে বিস্ময়াবাক হতে হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট অঙ্কের ওয়াদা করেছেন। এবং ওয়াদা করার সময় তার মনে পুরোপুরি স্বস্তি বা নিশ্চয়তা নেই যে, উহা পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন কি না। কিন্তু আন্তরিক নিষ্ঠা, সাহস ও উদ্যমের দরুন ওয়াদা করে ফেলেন। তারপর দোয়া করেন যেন আল্লাহ্‌ তা'লা উহা পূরা করার উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেন। তারপর, গায়েব থেকে যথাযথ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। অনেক সময় অবিকল ওয়াদা করা সেই অঙ্কের টাকাই হঠাৎ পাওয়া যায়, অর্থাৎ যেমন কেউ ৭০৭২ টাকার ওয়াদা করেছিল। তারপর খোদাতা'লার পক্ষ থেকে তাকে নিশ্চিৎ এই বিশ্বাস দান করার উদ্দেশ্যে যে, তিনি বিশেষভাবে তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে গ্রহণ করে তাকে উহা (সংগ্রহ করে) দিলেন, যাতে সে তার উপহার খোদাতা'লার সমীপে পেশ করতে পারে। এবং যে পরিমাণ টাকা তিনি পান তা সাত হাজার বাহাত্তরই হয়ে থাকে। এই ধরনের ঘটনাবলী আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে এক জীবন্ত ও নিত্য-নৈমিত্তিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। এসব কোন অতীতের কাহিনী নয়। বরং যেমন অতীতে ছিল, তেমন আজও আছে। যেমন আজ আছে তেমনি আগামীতেও থাকবে। এই ঐশী-নিদর্শন—সত্যতা ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্যতীত ভূ-পৃষ্ঠে অন্য কোনও জামাতকে দান করা হয় নি। তদুপরি, তারা আনন্দ ও প্রফুল্লতা এরূপ অনুভব করে থাকেন যে, আমি যেমন কিনা বর্ণনা করে এসেছি, প্রতেক বছর, প্রত্যেকবার সমাগত উপলক্ষে কুরবানীতে তারা পূর্বাপেক্ষা অগ্রসরমান হতে থাকেন। এর দ্বারা সুস্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে, প্রীতি ও ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে থাকেন। জরিমানা ও বোঝা মনে করে তো ওরূপে খরচ করতে পারে না। গতকাল MTA-তে যে "লিকা মায়াল আরব"-এর প্রোগাম ছিল উহাতে মুহাম্মদ হিলমী সাহেব একটি প্রশ্ন করেছিলেন যে, নববর্ষের কথাবার্তা চলছে। মানুষ নববর্ষের আনন্দ উৎসব উদযাপন করছে। আহমদীয়া জামাতের এ ক্ষেত্রে কী অবস্থান, বা কী ভূমিকা? এ প্রসঙ্গে আমি সবিস্তারে এ বিষয়টিও তাকে বুঝিয়ে বলি যে, আহমদীয়া জামাতের প্রত্যেক সমাগত বছর বিগত বছরের

চেয়ে অনিবার্যতঃ উৎকৃষ্টতর হতে থাকে। এরূপ কখনও হতে পারে না যে, আহমদীয়া জামাতের উপর এরূপ কোনও বছর উদিত হয়, যা বিগত বছর অপেক্ষা সৎকর্মাবলীর ক্ষেত্রে কোনও দিক দিয়ে পিছিয়ে যায়। বরং অবশ্য অবশ্যই এগিয়ে যায়। এবং এ বিশেষত্বটির সম্পর্ক হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে যুক্ত। কেননা, তাঁর (সাঃ) সাথে আল্লাহ্ তা'লা একটি ওয়াদা করেছেন। সে ওয়াদাটি প্রত্যেক সেই ব্যক্তি এবং প্রত্যেক সেই জামাতের স্বপক্ষে অবশ্য অবশ্যই পূরা হবে, যারা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়। সে ওয়াদাটি হচ্ছে: "ওয়া লাল-আখেরাতু খাইরুল্ লাকা মিনাল উ'লা' —তোমার জন্যে অবিচল ও অপরিবর্তনীয় কানুন হচ্ছে যে, তোমার প্রত্যেক আসন্ন (বা পরবর্তী) মুহূর্ত তোমার প্রত্যেক অতিক্রান্ত (বা পূর্ববর্তী) মুহূর্তের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে। ইহা সত্ত্বেও তাঁর (সাঃ) জীবনে পরীক্ষা ও সংকটাবলীও এসেছে। বহু রকমের বিপদ আপতিত হয়েছে। দৈহিক দুঃখ-কষ্টও তাঁকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ওয়াদা বাস্তবায়িত হতে থাকে। কোনও নির্যাতনই তাঁর অগ্রসরতাকে রোধ করতে পারে নি। অতএব, এর অর্থ এ নয় যে, সাময়িক দুঃখ-কষ্টগুলো আসবে না আর। এর অর্থ বরং এই যে, দুশমন যা ইচ্ছা করুক, তবুও তাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে, তোমার পরবর্তী মুহূর্তগুলোকে তোমার বিগত মুহূর্তের চেয়ে নিকৃষ্টতর করে দেখায়। বরং অনিবার্যতঃ সেগুলো অধিকতর শান ও মর্যাদায় সমুজ্জ্বল হবে। অনিবার্যতঃ সেগুলোকে উন্নততর ও উচ্চতর মর্যাদায় ভূষিত করা হবে। অতএব, আমি ঐ অনুষ্ঠানে তাঁকে উক্ত বিষয়ে সংক্ষেপে এ কথা বলেছিলাম যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আকারে বর্তমানে উহার উক্ত ওয়াদা পূরণের জীবন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান এবং এটা ইহাও প্রমাণ করে যে, আমাদের (এক জীবন্ত) সম্পর্ক রয়েছে ঐ মহিমান্বিত রসূলের (সাঃ) সাথে, যাঁর স্বপক্ষে উক্ত ওয়াদা দেয়া হয়েছিল এবং (এর ফলশ্রুতিতে) সেই ওয়াদা আমাদের স্বপক্ষে পূর্ণতা লাভ করে চলেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য জামাতগুলোর স্বপক্ষে উহা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'লাই উত্তম জানেন, রসূলের (সাঃ) সাথে সম্পর্ক কাদের আছে, এবং কাদের নেই। (তবে) যখন তিনি তাঁর ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করে দেখান, তখন এ বিষয়টি প্রকাশ করে দেন যে, যাদের সে সম্পর্ক আছে তা কোন ঢাকা-ছাপা বিষয় নয়। তাদের মাঝে আপনারা ঐসব ওয়াদা পূর্ণ হতে দেখবেন, যা প্রিয় রসূল (সাঃ)-এর সাথে করা হয়েছিল।

অতএব, জামাত আহমদীয়ার আর্থিক কুরবানীসমূহ আশ্চর্যজনকভাবে সত্যতার নিদর্শনই বটে; এবং তাদের এসব (আর্থিক) কুরবানী আন্তরিক নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। কাজেই, মানুষে লক্ষবার খোঁচা দিক না কেন যে, এরা তো চাঁদার কথা বলে, কিন্তু আপনারা এই বাস্তব ও মৌলিক সত্যের উপরে পুরোপুরি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকবেন।

এই সত্য থেকে আপনাদের নিষ্ঠা ও সততার পদক্ষেপ কখনও বিচ্যুত হওয়া উচিত নয় যে, আপনারা যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় পেশ করে থাকেন ইহা কোন জরিমানা ও বোঝাস্বরূপ নয়। বরং এসব হচ্ছে ভালোবাসার সম্পর্ক, ভালোবাসার অঙ্গীকার, যা আপনাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মের সেবা অর্থাৎ দীনে-ইসলামের উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানীর জন্যে বাধ্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত করে চলেছে। বহিরাগত কোনও চাপ নয়, বরং অন্তরের এক আকাঙ্খা যে, সেই আল্লাহ্‌ যিনি সবকিছু দিয়েছেন আপনারাও যাতে তাঁর পথে কিছু 'তোহ্‌ফা' পেশ করতে পারেন, যা তাঁর কাছে গৃহীত হয় এবং আপনাদের যৎসামান্য উপহারের মোকাবেলায় মহব্বতের সওদাস্বরূপ গণ্য হয়। যাতে এর দরুন তাঁর প্রীতিভরা দৃষ্টি আমাদের উপরে পতিত হতে আরম্ভ করে।

এ দিক দিয়ে ওয়াক্‌ফে জাদীদও ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বব্যাপী জামাত আহমদীয়া সব ধরনের চাঁদা পেশ করে চলেছে। তাদের মাঝে সেই সাথে যখন ওয়াক্‌ফে-জাদীদ যোগ করা হলো, তখন অন্যান্য চাঁদাগুলোর কোনও কম্‌তি বা ঘাট্‌তি হলো না। বরং একই সাথে এই চাঁদাও বাড়তে শুরু করলো। ইহা অদ্ভুত এক ব্যাপার যে, এই জামাতের উপর যত ইচ্ছা বোঝা চাপিয়ে দিন না কেন, তারপর আরও চাপান না কেন, তবুও তাদের গতিবেগ দ্রুততর হয়ে পড়ে। শ্লথ হয় না কোন মূল্যেও। যদিও তারা যত ভারেই ভারাক্রান্ত হোন না কেন, বরং যতজন নূতন ভারবাহী পরবর্তীতে দাখিল হতে থাকুন না কেন, তারাও অনুরূপ দ্রুতগতিতে, অনুরূপ শান ও মর্যাদার সাথে ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রগামী হন। বস্তুতঃ যে দিক থেকেই দেখুন না কেন আহমদীয়া জামাতের জীবনের লক্ষণাবলীই পরিলক্ষিত হয়। এবং এ লক্ষণাবলী ততদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে যতদিন পর্যন্ত রূহানীয়ত জীবিত থাকবে—যতদিন খোদাতা'লার সাথে আপনাদের সম্পর্ক জীবিত থাকবে। যতদিন পর্যন্ত আপনারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় আপনাদের আর্থিক কুরবানীকে উক্ত আয়াতের পদ্ধতি ও নকশা অনুযায়ী ঢেলে সাজাবেন। যা আমাদেরকে নির্দেশ দেয় যে তোমরা প্রেম ও ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে এবং উহারই তাগিদে খোদাতা'লার হুযুরে পেশ করবে। ভয় করবে না। তখন আল্লাহ্‌ তা'লা তোমাদের উপর এরূপ ফযল অবতীর্ণ করবেন, যার ফলশ্রুতিতে তোমরা নিজেরাই বিস্ময়াবাক হয়ে পড়বে। প্রত্যেক বছর জামাতের আর্থিক কুরবানীর পরিমাণ বৃদ্ধি একদিকে যেমন এ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, জামাত আহমদীয়া নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় বেড়ে চলেছে, তেমনি অন্যদিকে ইহা এ কথার স্বাক্ষর বহন করছে যে, খোদাতা'লা এই জামাতের সপক্ষে তাঁর ওয়াদাসমূহ পুরা করে চলেছেন। আর সেজন্যেই এতো বিপুল আর্থিক কুরবানী করা সত্ত্বেও জামাত আহমদীয়া গরীব হয়ে যায় নি, বরং পূর্বাপেক্ষা ধনী হয়েছে। উক্ত প্রেক্ষাপটে আমি এখন আপনাদের সামনে ওয়াক্‌ফে জাদীদের কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি।

অতঃপর, হুযুর (আইঃ) ৭৩টি দেশ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টসমূহের প্রেক্ষিতে জ্ঞাত করেন যে, ১৯৯৫ সালে ওয়াক্‌ফে জাদীদের ওয়াদা ছিল, ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৫ হাজার রুপী এর মোকাবেলায় এ যাবৎ প্রাপ্ত রিপোর্টসমূহ অনুযায়ী ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৬ হাজার রুপী উসুলী হয়েছে। হুযুর (আইঃ) বিগত দু'বছরের তুলনা ছাড়াও বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন দেশের এবং জামাতসমূহের উন্নয়নের তুলনামূলক অবস্থার ও তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, পাকিস্তান ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য (১৫৪টি) দেশের মাঝে আমেরিকা ওয়াক্‌ফে জাদীদের আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রথম হয়েছে। পাকিস্তান সারা বিশ্বে এবারও সর্বোচ্চ অগ্রগামী হওয়ার তওফীক লাভ করেছে। জার্মানী তৃতীয় অবস্থানে, তারপর পর্যায়ক্রমে কানাডা, ইংল্যাণ্ড ভারত, সুইজারল্যাণ্ড, ইন্দোনেশীয়া এবং জাপান রয়েছে।

হুযুর (আইঃ) অত্যন্ত তাগিদের সাথে এই নির্দেশ দান করেন যে, নব দীক্ষিতদেরকে মালী কুরবানীতে অবশ্যই শামিল করুন এবং শুরুতে তাদের কাছ থেকে তাদের তওফীক ও সামর্থ্য অনুযায়ী উসুলী করুন, যাতে মহব্বতের বিষয়-বস্তু কায়েম থাকে। যে একবার খোদাতা'লার পথে মহব্বতের সাথে কিছু পেশ করার তওফীক পায়, সে তারপর স্থায়ীভাবে ইহার স্বাদ পেয়ে যায়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় মালী কুরবানীর মৌলিক প্রেরণা ('রূহ্‌') হওয়া উচিত "তায়াল্লুক বিল্লাহ্‌'—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় সম্পর্ক। এরই ভিত্তিতে যে যতটুকু চাঁদা দানের তওফীক রাখে ততটুকুই তার কাছ থেকে গ্রহণ করুন।

খোৎবার পরিশেষে হুযুর (আইঃ) কয়েকজন পরলোকগামীর উল্লেখ করেন, যাঁদের নামায-জানাযা-গায়েব হুযুর জুমুআর নামায আদায়ের পর পড়ান। মরহুমদের মধ্যে বিশেষভাবে মুকাররম মাওলানা আবুল মনীর নূরুল হক সাহেব সম্পর্কে হুযুর অত্যন্ত মহব্বত ভরা স্মৃতিচারণ করেন। তিনি মজলিস ওয়াক্‌ফে জাদীদের প্রারম্ভিক মেম্বারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সিলসিলার বিশিষ্ট আলেম। তিনি বিভিন্ন অবস্থান ও স্তরে জীবনের শেষ অবধি সিলসিলার খিদমতের তওফীক লাভ করেন।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে অনূদিত ও সংক্ষেপিত)

মানুষের জন্য সহানুভূতি

"মানবমণ্ডলীর সাথে সহানুভূতিতে আমার ধর্মমত এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর জন্য দোয়া না করা হয় পরিপূর্ণভাবে বক্ষঃ পরিষ্কার হয় না.....কৃতজ্ঞতার কথা এই যে, আমাদের নিজেদের দৃষ্টিতে আমরা এমন কোন শত্রু দেখি না যাদের জন্যে ২/৩ বার দোয়া করি নি। এমন একজনও নেই আর আমি তোমাদেরকে বলছি.....। অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ, তোমাদের উচিত যে, তোমরা এমন এক জাতিতে রূপান্তরিত হও যে, যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ফাইন্নাহুম কাওমুন লা ইয়াশকা জালীসুহুম—অর্থাৎ তারা এমন এক জাতি যে, তাদের সাথে সহঅবস্থানকারী খারাপ হতে পারে না"।

(মলফুযাত: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭)

ঈদুল ফিতরের খোৎবা

সৈয়্যাদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

অনুবাদ: মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

(৭ই জুলাই, ১৯৪৮ইং কোয়েটাস্থ ইয়োর্ক হাউসে প্রদত্ত)

বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ নিজের মধ্যে স্ব-বিরোধী ভাবানুভূতির সৃষ্টি করিতে পারে না। অথবা বলা হইয়া থাকে যে, পরস্পর বিরোধী মনোভাব বা ভাবাবেগ মুনাফিকের লক্ষণ বিশেষ। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, পরস্পর প্রতিকূল ভাবানুভূতি প্রত্যেক যুগে এবং সব সময়ই মুনাফাকাত বা কপটতার লক্ষণস্বরূপ হয় না। বরং কোন কোন সময় বিপরীতমুখী ভাবাবেগ পেশ করাটা উচ্চাঙ্গীন আখলাক (বা চারিত্রিক গুণ)-এর পরিচয় হইয়া থাকে। বরং সত্য কথা এই যে, যদি বিপরীতমুখী ভাবাবেগ পেশ না করা হয়, তাহা হইলে উহা মানুষের দুর্বলতা বলিয়া গণ্য হয়। হযরতে আকদাস রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে একবার একজন সাহাবীকে জেহাদে পাঠানো হইল। তাঁহার বাচ্চা অসুস্থ ছিল। তিনি তাহাকে অসুস্থাবস্থায় রাখিয়া, কোন ওজর-আপত্তি ব্যতিরেকে জেহাদে চলিয়া যান। যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী স্নানাদি সারিয়া (সাজ-সজ্জা করিয়া) তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য অপেক্ষামান রহিলেন। সাহাবী ঘরে আসিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাচ্চা কেমন আছে?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "বাচ্চা এখন সম্পূর্ণ সুস্থির আছে।" তারপর স্বামীকে আহার করাইলেন এবং এদিক-ওদিকের বিভিন্ন কথা বলিতে থাকিলেন। রাত্রে যখন বিছানায় গেলেন, তখন স্ত্রী কহিলেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহারো নিকট আমানত রাখিয়া যায় এবং কিছুকাল পর সে তাহার আমানত ফেরৎ লইতে আসে, তাহা হইলে তাহার আমানত ফেরত দেওয়া উচিত কি না?' তিনি 'বলিলেন, ইহাও কি কোন একটা সমস্যা? যদি কাহারো আমানত থাকে উহা তাহাকে নিশ্চয় ফেরৎ দেওয়া উচিত।" স্ত্রী বলিলেন, "আমাদের নিকটও বাচ্চার আকারে আল্লাহ্‌তা'লার একটি আমানত ছিল, যাহা তিনি ফিরাইয়া নিয়াছেন এবং সে ইন্তেকাল করিয়াছে।"

(সহী মুসলিম, কিতাব ফাযায়িলে আব্, তালহাতাল আনসারী; বুখারী; কিতাবুল জানায়েব।

এখন দেখুন, সেই মহিলার ঈমানের স্বরূপ বা অবস্থাটি ছিল এই যে, তিনি তাঁহার শোক ও দুঃখকে চাপিয়া গিয়াছিলেন এবং উহাকে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া পরিপাটি হইয়া বসিয়াছিলেন এবং

তাঁহার স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, এবং (প্রথমেই) ইহা জানান নাই যে, বাচ্চা মারা গিয়াছে, যাহাতে তাঁহার মনে বেশী আঘাত না লাগে এবং উহার ফলশ্রুতিতে তিনি এমন কোন কথা বলিয়া না বসেন যেজন্য তাঁহার সওয়াবে ব্যাঘাত ঘটে। বাহ্যতঃ এই অনুভূতি ছিল আসল অবস্থা ও অনুভূতির বিপরীত। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে এই আবেগ ও অনুভূতিই ছিল সেই সময়ের জন্য তাঁহার ঈমানের যথার্থ চিত্র। যদি তিনি তাঁহার অভ্যন্তরীণ ভাবানুভূতিকে প্রকাশ করিয়া দিতেন এবং কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি বিপরীতমুখী ভাবাবেগ অভিব্যক্ত করিতেন না, বরং তাঁহার জাহের ও বাতেন (ভিতর ও বাহির) অবশ্য একই হইত। কিন্তু তাঁহার সেই কাজটি হইত ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক। এই জাতীয় আখলাক-আচরণ কোরবানী ও ত্যাগের পরিপন্থী। অতএব, কোন কোন পরস্পর পরিপন্থী বিষয়ও এরূপ হইয়া থাকে, যাহা কিনা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ও যথার্থ হইয়া থাকে। একই ধরনের ভাবাবেগের অভিব্যক্তি সবখানেই পসন্দনীয় বা শোভনীয় হয় না। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য একজনের প্রতি অসন্তুষ্ট আছে। সে তাহার নিকট আসিল। তখন সে প্রফুল্লতার সহিত তাহার সঙ্গে দেখা করিল এবং নিজের অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করিল না, যদিও তাহার অন্তরে তখনও ক্ষোভ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উহা চাপা দিতে সে অনেকটা সফল হইয়া যায়। কিন্তু আর এক ব্যক্তি এরূপ যে শেষোক্ত ব্যক্তিটি অধিক পরিষ্কার অন্তরে—যাহা কিছু তাহার অন্তরে থাকে তাহা সে প্রকাশ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, রাগ সংবরণ করা এবং তাহাতে সফল হইতে পারা যদিও বাহ্যতঃ অভ্যন্তরীণ ভাবানুভূতির পরিপন্থী কাজ কিন্তু সে ব্যক্তিই সত্য এবং প্রকৃত মুমেন বলিয়া বিবেচিত হইবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৫ ; সহী বুখারী কিতাবুল আদব বাবলু হাযরে মিনাল গাযাব দ্রষ্টব্য)।

অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য ঈদও বস্তুতঃ ঈদ হয় না। হাজার হাজার মুসলমান এমনও আছে, যাহাদের গৃহে আজ হয়তো মাতমের অবস্থা বিরাজ করিতেছে। চল্লিশ কোটি (এখন ১০০ কোটিরও অধিক—সম্পাদক) মুসলমানের মধ্যে এমনতো হইতে পারে না যে, কোন একজনের গৃহেও আজ মৃত্যু ঘটে নাই। ঐরূপ অবস্থায় কেহ কেহ তো তাহাদের দুঃখ-বেদনার কারণে ঈদে কোন অংশই গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। আবার কেহ কেহ এমনও হইতে পারে যাহারা 'মাইয়্যাত' (শব দেহ)-কে আল্লাহ্‌র হাওলায় ন্যস্ত করিয়া ঈদের নামায আদায়ের জন্য চলিয়া গিয়াছে। এখন যাহারা বাহ্যতঃ নামাযের উদ্দেশ্যে চলিয়া গিয়াছে, তাহারা মুনাফেকাত বা কপটতা দেখাইয়াছে। তাহাদের 'জাহের' (বাহ্যিক অবস্থা) এক ছিল এবং 'বাতিন' (ভিতর) ভিন্ন ছিল। আর যাহারা গৃহে বসিয়া থাকিল তাহারা পরিষ্কার অন্তরের খাঁটি লোক ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহারা তাহাদের পরলোক-

গমনকারী ব্যক্তিদের শবদেহকে খোদার হাওলা করিয়া ঈদ উদযাপনের উদ্দেশ্যে চলিয়া গিয়াছে তাহারাই সত্যকার মুমেন। কেননা, তাহারা খোদাতা'লার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকে নিজেদের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির উপর অগ্রাধিকার দিয়াছে।

ইহা তো একটি ব্যক্তিগত বিপদ ও মসিবতের দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহার মোকাবিলায় আজ লক্ষ লক্ষ (বরং কোটি কোটি) মুসলমান আছে, যাহারা স্বচক্ষে দেখিতেছে যে, ইসলামের নাম আজ শুধু মুখেই আছে এবং কুফরী দুনিয়াতে প্রবল আকারে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহাদের অন্তরের কোন দুঃখ-বেদনা রেখাপাত করে না, কোন যাতনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় না। তাহারা ঈদ উদযাপন করে—কাপড় বদলায়, আতর লাগায়, সকাল বেলায় দেশের রেওয়াজ (রীতি) অনুযায়ী সেমাই (ও অন্যান্য মিষ্টান্ন) নাস্তা করে। অথচ বর্তমানে ইসলাম এরূপ নাজুক বিপদ-সঙ্কুল অবস্থার মধ্য দিয়া অতি-বাহিত করিতেছে, যাহা দেখিয়া কোন প্রকৃত ও সত্যিকার মুসলমান গভীর আঘাত অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। যদি মুসলমানরা ক্ষত-বিক্ষত অন্তরের সহিত ঈদের নামাযের জন্য যাইতো, খণ্ডিত ও রক্তঝরা হৃদয় লইয়া নামায আদায় করিত, তাহা হইলে যদিও তাহাদের ভাবানুভূতি বিরোধী হইতো কিন্তু প্রকৃত ঈদ তাহাদেরই হইতো। অতএব, যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়িল কিন্তু তাহার অন্তরে ইসলামের জন্য দরদ সৃষ্টি হইল না, তাহার অন্তর-দৃষ্টি মৃত ও অন্ধ। প্রকৃত ও সত্যিকার ঈদ কেবল তাহারই, যে পরস্পর বিরোধী ভাবাবেগ সহকারে ঈদ উদযাপন করে। তাহার অন্তর মাতম করে এবং তাহার 'জাহের' (বাহ্যিকভাবে) ঈদ উদ্‌যাপন করে। আমরা দেখিতে পাই যে, দুনিয়ার সকল জাগ্রত ও জীবনীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাহাদের জাতীয় অনুপ্রেরণা দেখা যায়—তাহারা সেরূপ আদর্শের পরিচয়ই দিয়া থাকেন। জার্মানীর এক মহিলা ছিলেন, তাহার বয়স প্রায় আশি বছর। তাঁহার সাতজন পুত্র ছিল। তাহারা সকলেই যুদ্ধে নিহত হয়। আমাদের দেশে যদি কাহারও এমনটি ঘটে, তাহা হইলে ইহা সচরাচর কাহারও অনুভূতিকে স্পর্শ করিবে না। কিন্তু জীবিত জাতিবর্গ তাহাদের মধ্যে কে কত কোরবানী (ত্যাগ স্বীকার) করিয়াছে—এই ধরনের বিষয়গুলি নোট করিতে থাকে। যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নিকট ইহার সংবাদ পৌঁছিল, তখন তিনি বলিলেন যে, তাহাকে (বৃদ্ধা মহিলাকে) ডাকিয়া আন, সম্রাট এবং দেশের পক্ষ হইতে তাহার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইবে। অতএব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিজে পত্র লিখিলেন। যখন উক্ত বৃদ্ধা আসিলেন তখন মন্ত্রী বলিলেন, আমি সম্রাট এবং দেশের পক্ষ হইতে আপনার সমীপে সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। কেননা, আপনার সাতজন পুত্রের মধ্যে সকলই যুদ্ধে নিহত হইয়াছে? একটি ইংরেজী পত্রিকার প্রতিনিধিও ঐ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। আমি পত্রিকায় প্রকাশিত তার প্রতিবেদন পাঠ

করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, যখন সেই বৃদ্ধা মহিলা কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, তখন ইহা সত্ত্বেও যে, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কুঁজ হইয়া গিয়াছিল তাহার পৃষ্ঠদেশে তাহার উভয় হাত রাখিয়া তাহার কোমরে চাপ দিয়া সোজা করিলেন এবং কৃত্রিম (মৃদু) অট্টহাসি দিয়া বলিতে ছিলেন, তাহাতে কি-বা হইল, যদিও আমার শেষ পুত্রটিও নিহত হইয়াছে? যাহাই হউক না কেন তাহারা তো দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াই প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।" কাজেই দেখুন, ঐ মহিলাটির মধ্যে জাতীয় সেবায় কতখানি অনুপ্রেরণা ছিল। দুনিয়াকে তিনি অবগত করাইতে চাহিয়াছিলেন যে, আমার পুত্র নিহত হওয়াতে আমার কোমর বাঁকিয়া যায় নাই, বরং তাহা আমার কোমরকে আরও সোজা করিয়া দিয়াছে। কেননা, তাহারা দেশের খাতিরে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।" এক্ষণে এমন তো নহে যে, তাহার অন্তর তাহার পুত্রদের মৃত্যুতে দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইল না, হৃদয় তো অবশ্যই ব্যথিত ছিল। কিন্তু সেই মহিলা দুনিয়ার সামনে ইহাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাহার জন্য দুঃখ আনয়নকারী তকদীরের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। কিন্তু তাহার জাতির জন্য তিনি সম্মান ও গৌরবের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শিশু পুত্র ইব্রাহীম যখন ইন্তেকাল করিলেন তখন তিনি (সাঃ) তাহাকে দাফন (কবরস্থ) করেন এবং দাফনকার্য সারিবার পর বলেন, 'যাও তোমার ভ্রাতা ওসমান বিন মযউনের নিকট চলিয়া যাও।" আর সেই সময় তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। (সহী বুখারী ও মুসলিম)। কিন্তু সেই সময়টি যখন অতিবাহিত হইয়া গেল, তার পরক্ষণেই আবার তিনি পূর্ববৎ জোশ ও অধ্যবসায়ের সহিত দীনের খেদমতে আত্মনিয়োজিত হইয়া পড়িলেন। মোট কথা, প্রকৃত মোমেনের শান ইহাই হইয়া থাকে যে, সে জাতীয় ও ধর্মীয় দুঃখ-বেদনাকে নিজের ব্যক্তিগত শোক-দুঃখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিয়া থাকে এবং তাহার দৃঢ়সংকল্প, সাহস বল ও অধ্যবসায়ে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না বরং বিপদ ও মসিবত তাহার মনোবল ও দৃঢ় সংকল্পে আরও শক্তি যোগায় এবং তাহার দৃঢ়চিত্ততাকে আরও বাড়াইয়া দেয়। এ জন্য না যে, সে স্বস্তি লাভ করিয়াছে, বরং এই জন্য যে, এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি স্ব-বিরোধী উভয় প্রকার ভাবাবেগকে অনুভব করে, তাহা হইলে সে-ই প্রকৃত মুমেন হইয়া থাকে। বরং আমি তো বলি, সে-ই প্রকৃত মানব। কেননা, মানুষের কামালিয়ত ও উৎকর্ষতাও তখনই প্রকাশিত হয়, যখন সে অন্তরে দুঃখ অনুভব করে এবং নিজের 'জাহের'কে খোদাতা'লার ইচ্ছার অধীনস্থ করে।

বর্তমানকালে (দেশ বিভাগোত্তর ১৯৪৮ সনে—অনুবাদক) দুনিয়াতে হাজার হাজার গ্রাম-গঞ্জ ও শহর এমনও রহিয়াছে যেখানে মুসলমানদের বানানো মসজিদগুলি শূন্য ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়া আছে এবং সেগুলিতে খোদাতা'লার সম্মুখে কোন সেজদাকারী দেখা

যায় না। নির্মাণকারীরা তো সেগুলি এজন্যই নির্মাণ করিয়াছিল যে, সেগুলিতে যেন খোদাতা'লার যিক্‌র ও ইবাদত করা হয়। কিন্তু আজ সেগুলি জনমানবশূন্য ও জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। এক্ষণে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সকল মসজিদ পুনরায় ইসলামের আযমত ও গৌরবের এক একটি জীবন্ত নিদর্শনস্বরূপ হইয়া যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরআন করীমের (রূহানী) শাসন পৃথিবীর বুকে কায়েম হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যদি ব্যক্তি কেবলমাত্র জাহেরী (অর্থাৎ বাহ্যিকভাবেই) ঈদ পালনে সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং নূতন কাপড় পরিধান করিয়া মনে করিয়া লয় যে, সে ঈদ উদযাপন করিয়াছে, তাহা হইলে সে বে-গয়রাত। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি নিরুৎসাহিত হইয়া বসিয়া পড়ে, সে-ও অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও কাপুরুষ ব্যক্তি। আমাদের খোদা অবশ্য আমাদিগকে বাহ্যিকভাবে আনন্দ উদযাপন করিবার আদেশ দিয়েছেন এবং সেইজন্য আমরা আনন্দ উদযাপন করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত আনন্দ আমরা তখনই লাভ করিব, যখন বিশ্বব্যাপী সর্বত্র ইসলাম ছড়াইয়া পড়িবে যখন মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌তা'লার যিক্‌র ও ইবাদতকারীদের দ্বারা ভরিয়া যাইবে এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং কুরআন করীমের (রূহানী) শাসন পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কায়েম হইয়া যাইবে।

অতএব, আমাদের জামা'তের প্রতিটি ব্যক্তিরই স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলাম এবং মুসলমানদের বর্তমান অবস্থাকে দেখিয়া আমাদের ভিতরের জখম কখনও প্রশমিত হওয়া উচিত নয়। বরং আমাদের জখম যদি আরোগ্য লাভ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আমাদের উচিত নিজেদের অঙ্গুলীর দ্বারা সেগুলিকে খোঁচাইয়া পুনরায় তাজা করিয়া লওয়া। কেননা, আমাদের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ঈদ তখনই হইবে, যখন ইসলাম দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িবে এবং দুনিয়ার সকল কোণা হইতে 'আল্লাহু-আকবর' ধ্বনি উঠিতে আরম্ভ হইয়া যাইবে।

(দৈনিক 'আল ফযল ১৫ই মার্চ ১৯৬৯ইং-পুনঃ প্রকাশিত)

(২৮ পাতার পর)

এখানে আরো যে বিষয়টি উল্লেখের দাবী রাখে তা হলো এ অবস্থার কঠোর সমালোচনা ও ঘৃণা প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। সমাজকে অবক্ষয় মুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে সক্রিয় হতে হবে। সাথে সাথে সুন্দর শোভন সমাজ গড়ার সুচিন্তিত ও সুসংগঠিতভাবে প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। মানুষের হৃদয়ে মানবতাবোধ ও নৈতিকতার বীজ বুনতে হবে। এ বড়ই কঠিন কাজ। এজন্য চাই অপরিসীম ধৈর্য, চাই প্রেম-প্রীতি ভালবাসা, চাই স্নেহমমতা ও দয়ামায়ার নিবিড় পরশ। আরো চাই আমাদের মহৎ উচ্চারণের সাথে নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ আচরণের সংযোগ। আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই যে, এ যমানায় আল্লাহ্‌ তাঁর অপার করুণায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উপর অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব গড়ার মহান দায়ত্ব অর্পণ করেছেন। এ গুরু-দায়িত্ব পালনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ আমাদের সবার সহায় হউন। আমীন।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

এ চিত্র ধরে রাখা দরকার

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

সংবাদ পত্রাদিতে আজকাল এমন সব অশ্লীল ও রুচি বিরোধী খবরাদি প্রকাশিত হচ্ছে যা নিয়ে লিখবো কি লিখবো না তা স্থির করতে বেশ সময় কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত, যুগকে ধরে রাখার তাগিদে এবং সমাজ-চিত্রকে বিশেষ করে ধর্মীয় নেতাদের অধঃগতিকে প্রজন্মের শিক্ষা ও শোধনের জন্য কলঙ্কভুক্ত করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে লিখতে বসি। আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য কয়েকটি মাত্র খবর নেয়া হলো, যা বিবেকবান ও সমাজহিতৈষী মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না।

হাতেনাতে ধরা পড়েছে মাওলানা ছালাম

কোর্ট রিপোর্টার : সবুজবাগ থানা এলাকার পূর্ব গোড়ানের ৩৩৭নং বাড়ীর ছাদে রহিমা নামের নয় বছরের বালিকার সঙ্গে কুকর্ম করার সময় মাওলানা আবদুস ছালামকে এলাকার লোকজন হাতেনাতে আটক করে। তাকে সবুজবাগ থানায় সোপর্দ করে। মাওলানার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়।.....

মাওলানার ছবিসহ খবরটি দৈনিক জনকণ্ঠের ২-১১-৯৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম বটে

মসজিদের ইমাম নারী ধর্ষণকালে গ্রামের যুবকদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়েছে, তাও বিবস্ত্র অবস্থায়।

ঘটনাটি ঘটেছে ২০ জুলাই জেলার সদর উপজেলায় চকরামচন্দ্র গ্রামে। গ্রামের সামাজিক বিচারে ইমামের ১শ' বেত ও জুতার মালা পরিয়ে গ্রামে ঘুরানোর পর ইমামের কাজ হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। চকরামচন্দ্র গ্রাম মসজিদের ইমাম মোঃ সমশের আলী একই গ্রামের অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্তা সুন্দরী হাজেরা (৩০)কে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করে আসছিল। একদিন হাজেরা গ্রামের যুবকদের কাছে সব কথা খুলে বলে। যুবকদের কথামত হাজেরা ইমামের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গ্রামের এক পাট ক্ষেতে যায়। সময়মত সেখানে হাজেরা চিৎকার দিলে যুবকরা সমশের আলীকে বিবস্ত্রাবস্থায় ধরে নিয়ে আসে গ্রামবাসীর কাছে।

(সংবাদ : ১৪-৮-৯১)

পিতা-পুত্রের কাণ্ড

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর), ৪ জানুয়ারী (সংবাদদাতা) : শরণখোলা উপজেলার খুন্তাকাটা

গ্রামের জনৈক নূরুল ইসলামের যুবতী কন্যা শাহীনূর বেগম (১৮)কে একই গ্রামের মোঃ ওসমান গনি (৫৫) এবং তার পুত্র আব্দুল হাওলাদার (২৫) স্ত্রী বলে দাবী করেছে।

(দৈনিক ইনকিলাব, ৫-১-৮৯)

প্রাগৈতিহাসিক পাশবিকতা

দিনাজপুর অফিস : প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে জনৈক সখিনা খাতুনকে (৩৭) নয় ব্যক্তি পালাক্রমে বলাৎকার করেছে। বলাৎকারীদের মধ্যে এক পিতার সাথে দুই পুত্র এবং আর এক পিতার সাথে এক পুত্র রয়েছে। দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটেছে সদর থানার ১০নং কমলাপুর ইউনিয়নের পাতোলসা (সরকার পাড়া) গ্রামে। জনৈক মতিয়ার রহমানের স্ত্রী সখিনা প্রকৃতির ডাকে ঘরের বাইরে এলে তারা মুখে কাপড় গুজে উঠিয়ে নিয়ে এসে পিতা-পুত্র ও অন্যান্যরা মিলে প্রতিশোধ নেয়। ডাক্তারী পরীক্ষা শেষে গতকাল কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। (দৈনিক ইনকিলাব, ৩-৭-৯৫)

হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকিবে। তাহাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হইবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকিবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে ফেৎনা-ফাসাদ উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা ফিরিয়া যাইবে।" (বায়হাকী, মিশকাত)

মাওলানা আবদুস সালাম ও ইমাম মোঃ সমশের আলী নিকৃষ্টতম জীব হওয়ার চাক্ষুষ প্রমাণ রাখলো। সাথে সাথে এই যামানাই যে সেই যামানা সে সাক্ষ্যও তারা দিয়ে গেল। আল্লাহ্ সব দেখেন-এ বিশ্বাস এদের হৃদয়ে ঘুণাক্ষরে স্থান পেয়েছে বলে মনে হয় না। যে যুবকরা ইমাম মোঃ সমশের আলীকে হাতেনাতে ধরে দিয়েছে ও সতীত্ব রক্ষায় হাজেরা যে নিষ্ঠা দেখিয়েছে, এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ আশার উৎস। পিতা-পুত্রের কাণ্ড সম্পর্কে ফতোয়াবাজরা হয়ত শাহীনূর বেগমকে দায়ী করে ফতোয়া ঝাড়বে। 'প্রাগৈতিহাসিক পাশবিকতার' যে জঘন্যতম খবর দেয়া হয়েছে অনুরূপ খবর বোধ হয় দুনিয়াতে খুব কমই পাওয়া যাবে। তা-ও ঘটলো বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মুসলমানদের দ্বারা নিজেদের চরম নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার মাঝে সুস্থ বুদ্ধিবিবেচনার কোনই সন্ধান মিলে না।

বিভিন্ন স্তরের মুসলমানদের বিশেষ করে আলেমদের চূড়ান্ত ও ব্যাপক অবক্ষয়ের কথা গভীরভাবে বিবেচনা করলে উপলব্ধি করা কঠিন হয় না যে, তাদের একটা বড় অংশ 'আইয়্যামে জাহিলিয়ত'কে হার মানিয়েছে।

(অবশিষ্টাংশ ২৬ পাতায় দেখুন)

আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ
ভাষান্তর : মুহাম্মদ মুতিউর রহমান

(অষ্টম কিস্তি)

হাদীসের আলোকে মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যু

(১) হাদীসের মধ্যে হযরত ঈসা ইব্নে মরিয়মের সঠিক বয়স ১২০ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم قال فى مرضه الذى توفى فيه لفاطمة ان جبريل كان يعارضنى القران فى كل عام مرة و انه عارضنى القران العام مرتين و اخبرنى انه لم يكن نبى الا عاش نصف الذى قبله و اخبرنى ان عيسى ابن مريم عاش عشرين ومائة سنة ولا ارانى الا ذاهبا على رأس الستين -

(حجج الكرامة ص ٤٢٨ نيز كنزالعمال جلد ٦ ص ١٩٠ روايت فاطمة رض)

বঙ্গানুবাদ : উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বীয় ঐ অসুখের সময়ে যে অসুখে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন—হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেন, জিবরাঈল (আঃ) প্রত্যেক বছর একবার আমার সাথে কুরআন মজীদ আবৃত্তি করতেন আর এ বছর তিনি ২ বার আমার সাথে কুরআন আবৃত্তি করেছেন এবং তিনি আমাকে সংবাদ দিলেন যে, প্রত্যেক নবী তার পূর্ববর্তী নবীর অর্ধেক বয়স পর্যন্ত অবশ্য জীবিত থেকেছেন। আর তিনি আমাকে এই সংবাদও দিলেন যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম একশ' বিশ বছর জীবিত ছিলেন। আমি নিজের ব্যাপারে কেবল মনে করি যে, আমি ৬০ বছর বয়স হলে পরে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব।
(হুজাজুল কিরামা ফি আসারিল কিয়ামা : পৃষ্ঠা-৪২৮, আরও কনযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বর্ণনায়)

(২) হযরত নবী করীম (সাঃ) মৃত্যুকালীন রোগাক্রমণে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে এসে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন :

انكم تخافون موت نبيكم هل خلد نبى قبلى فيمن بعثت اليه فاخلد فيكم -

(المواهب الدنية جلد ٢ ص ٣٦٨)

অর্থাৎ, হে লোক সকল! আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুতে ভয় পাচ্ছো। আমাকে বলো যে, ইতোপূর্বে কোন নবী যাদের নিকট তিনি

আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের নিকট সর্বকালের জন্যে বেঁচে ছিলেন যে, আমি তোমাদের নিকট সব সময়ের জন্যে বেঁচে থাকবো? (মুহাযেবুলাদ্দুনইয়া : ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৮)

এসব বর্ণনা থেকে প্রকাশিত হয় যে, হযরত ঈসা আলায়হেস্‌সালাম ১২০ বছর জীবিত ছিলেন।

(৩) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا اتباعي -

(اليواقيت والجواهر مصنفه عبدالوهاب الشعراني رحمة الله عليه)

অর্থাৎ, যদি মূসা ও ঈসা উভয়েই জীবিত থাকতেন তাহলে তাদেরও আমার অনুসরণ করা ছাড়া গত্যান্তর ছিলো না। [আল ইউয়াকিত ওয়াল জওয়াহের, প্রণেতা আবদুল ওয়াহাব শি'রানী (রহঃ)]

এ হাদীসকে ইবনে কাসীরও স্বীয় তফসীর গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন। আর এই হাদীসের প্রতি দৃষ্টি রেখে ইমাম ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন :

لو كان موسى وعيسى حيين لكانا من اتباعه

(مدارج السالكين مصنفه امام ابن قيم جلد ٢ ص ٣١٣ قلمى)

অর্থাৎ, যদি মূসা ও ঈসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। (মাদারেজেস্‌ সালেকীন, প্রণেতা ইমাম ইবনে কাইয়্যেম, ২য় খণ্ড, পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা-৩১৩)

এই হাদীসকে আহলে সুন্নত আলেমগণ ব্যতিরেকে শীয়া আলেমগণও গ্রহণ করে লিখেছেন :

"তদুপরি আঁ হযরত (সাঃ) বর্ণিত 'লাও কানা মুসা ওয়া 'ঈসা ফী হায়াতিহিমা মা ওয়াসি'আহুমা ইল্লাত্তিবাঈ' অর্থাৎ যদি মূসা ও ঈসা উভয়েই দুনিয়াতে জীবিত থাকতেন তাহলে তাদের আমার অনুসরণ ব্যতিরেকে গত্যান্তর ছিলো না" (বাশারত আহমদীয়া পত্রিকা, প্রণেতা : আলী হায়েরী, পৃষ্ঠ-২৪)। আর শরাহ ফেকাহ্‌ আকবর মিশরী ছাপা, হাশিয়া ১১২ পৃষ্ঠা (১৯৫৫ সংস্করণ) এর মধ্যে হাদীসটি এভাবে লিখিত আছে"

'লাওকানা 'ঈসা হাইয়্যান্‌ লামা ওয়াসি'আহু ইল্লাত্তিবা'ঈ—অর্থাৎ, যদি ঈসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তার আমার অনুসরণ ব্যতিরেকে গত্যান্তর ছিলো না।

অতএব যেভাবে এই হাদীসে হযরত মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা উল্লেখিত রয়েছে এভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এরও মৃত্যুর কথা উল্লেখিত রয়েছে। আলী হয়েরী-এর 'ফী হায়াতিহিমা-এর অনুবাদ 'দুনিয়াতে ছিলেন' ... ... সঠিক নয় বরং সঠিক তরজমা এই যে, যদি মূসা ও ঈসা (আঃ) উভয়েই বেঁচে থাকতেন অর্থাৎ জীবিত থাকতেন তাহলে তাদের আমার অনুসরণ করা ব্যতিরেকে গত্যান্তর ছিলো না।

(৪) বিভিন্ন দৈহিক বর্ণনা ঃ

সহীহ বুখারীতে দু'টি হাদীস এমন আছে যাতে আঁ হযরত (সাঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

একটি হাদীস তো উহা যার মধ্যে এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) বিগত নবীগণকে কাশ্‌ফী (দিব্য-দর্শন) অবস্থায় দেখেছেন। এতে হুযুর (সাঃ) বলেন—

رأيت عيسى و موسى و ابراهيم فاما عيسى فاحمر جعد عريض الصدر واما موسى فادم جسيم سبط الشعر كانه من رجال الزط و اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم - (صحيح بخارى كتاب بدء الخلق)

বঙ্গানুবাদ : আমি ঈসা, মূসা ও ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে দেখলাম। হযরত ঈসা লোহিত বর্ণ, বক্রকেশ এবং প্রশস্ত বক্ষঃ ছিলেন। আর হযরত মূসা (আঃ) গোধূম বর্ণের, দীর্ঘদেহী সরল কেশ সম্বলিত ছিলেন যেন 'যত' গোত্রের পুরুষদের ন্যায় এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে যদি দেখতে চাও তাহলে তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ আমাকে দেখো। (সহী বুখারী কিতাব বাদা'আল্‌ খালক)

এথেকে জানা যায় যে, আঁ হযরত (সাঃ) এই কাশ্‌ফে বিগত মৃত নবীদেরকে দেখেছিলেন যাঁদের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-ও ছিলেন।

অন্য একটি হাদীসে এরূপ কাশ্‌ফের বর্ণনা আছে যার মধ্যে আঁ হযরত (সাঃ)-কে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য অবস্থা দেখানো হয়েছে। এবং হুযুর (সাঃ) দাজ্জাল প্রভৃতিদিগকে দেখেছিলেন। এর মধ্যে হুযুর (সাঃ) উম্মতের মধ্য থেকে ভবিষ্যতে আগমনকারী মসীহ্‌ মাওউদকেও দেখেছিলেন। এবং তার যে দৈহিক বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রথমোক্ত দৈহিক বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, আগমনকারী মসীহ্‌ মাওউদকে ঈসা ইবনে মরিয়ম নামকরণ করা হয়েছে কেবল অধিক সাদৃশ্য থাকার কারণে। ইহা নয় যে, প্রথম মসীহ্‌ এবং তিনি একই ব্যক্তি।

হুযুর (সাঃ)-বলেন :

بينما انا نائم اطوف بالكعبة فاذا رجل ادم سبط الشعر فقلت من هذا قالوا هذا المسيح بن مريم - (صحيح بخارى باب ذكر الدجال)

অর্থাৎ এ অবস্থায় যে, আমি শায়িত ছিলাম। আমি দেখলাম যে, আমি কা'বার তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করছিলাম, তখন গোধূম বর্ণের সরল কেশসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম "ইনি কে?"। তখন তিনি আমাকে বল্লেন, "ইনি ঈসা ইবনে মরিয়ম।" (সহী বুখারী বাবু যিক্‌রুদ্দাজ্জাল)

এ হাদীসেরই পরবর্তী অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) দাজ্জালকেও

দেখেছেন। এথেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, এ দৈহিক বর্ণনা আগমনকারী-মসীহের যেভাবে ঘটনাও তা পূর্ণ করে দেখিয়ে দিয়েছে।

উম্মতের সর্ববাদীসম্মত মত ঃ

আহলে ইসলামের ইহা ঐকমত্য ধর্মীয় বিশ্বাস যে, কুরআন করীম, নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নত এবং হাদীসের পরে চতুর্থ ধাপ হলো ইজমা' (সর্ববাদীসম্মত মত)-এর—একটি শরীয়তি দলীল যাকে মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অবশ্য কর্তব্য।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে সর্বপ্রথম যে ইজমা' সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক সাহাবী (রাঃ) অংশ নিয়েছিলেন তাহলো মসীহ (আঃ)-এর মৃত্যুর ওপরে। ইহা একটি নিরেট দলীল।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যু সাহাবায়েকেরাম (রাঃ)-এর জন্যে একটি অসহনীয় দুঃখ-বেদনার বোঝা ছিলো। আর তাদের মধ্যে কতক স্বভাবজ ভালবাসার কারণে এ সত্যকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। যেমন, হযরত উমর (রাঃ) ঐসব সাহাবাগণের মধ্যে ছিলেন যাঁরা আঁ হযরত (সাঃ)-কে মৃত মনেই করতে পারছিলেন না। যেমন লেখা আছে যে, হযরত উমর (রাঃ) বলছিলেন :

ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا يموت حتى يقتل الله المنافقين -
(در منثور للامام جلال الدين السيوطى جلد ۴ ص ۳۱۸)

অর্থাৎ, আঁ হযরত (সাঃ) মারা যান নি। আর ঐ সময় পর্যন্ত মারা যাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তালা মুনাফিকগণকে বিনাশ না করবেন। (দুর্‌রে মানসূর লে ইমাম জালালুদ্দীন সাইউতি, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৮)

এ রকম সংকটপূর্ণ অবস্থায় আল্লাহ্ তালা হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে দণ্ডায়মান করলেন। তিনি (রাঃ) সকল দুঃখ-ভারাক্রান্ত সাহাবাগণকে এক স্থানে সমবেত করলেন এবং মেম্বরের ওপরে দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদান করলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে সাধারণভাবে এবং হযরত উমর (রাঃ)-কে বিশেষভাবে উদ্দেশ্য করে বলেন,

ايها الرجل اربع على نفسك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات الم تسمع "انك ميت و انهم ميتون" "و قال ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون" ثم تلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم - (تفسير در منثور جلد ۴ ص ۳۱۸)

বঙ্গানুবাদ ঃ হে লোক সকল! ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন। তোমরা কি কুরআন করীমের এ আয়াত শোন নি—ইন্নাকা মায়্যিতুন ওয়া ইন্নাহুম মায়্যিতূন (তুমিও মারা যাবে এবং তারাও মারা যাবে)। আর আল্লাহ্ও বলেছেন, আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে সর্বকালের জন্যে জীবন দেই নি। ইহা কি হতে পারে

যে, তুমি তো মরে যাবে আর তারা সর্বকালের জন্যে (জীবিত) থাকবে। এর পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন—ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন ... ... আল আখের (মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল ব্যতিরেকে কিছু নয়, তাঁর পূর্বে সকল রসূল গত হয়ে গেছে। যদি সে মারা যায় বা নিহত হয় তাহলে তোমরা কি তোমাদের পায়ের গোড়ালীর ওপরে পিছনে ফিরে যাবে?)

আর বুখারী শরীফের মধ্যে এ ঘটনার উল্লেখ এভাবে এসেছে। যেমন, হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেন :

اما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات و من كان منكم يعبد الله فان الله حى لايموت قال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى الشاكرين -

(بخارى كتاب المغازى باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইবাদত করতেছিলে তারা শুনে রাখো যে, মুহাম্মদ (সাঃ) মারা গেছেন আর তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেছিলে তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ্ জীবিত আছেন তিনি মারা যান না। পুনরায় তিনি (রাঃ) বলেন —আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মুহাম্মদ রসূল ব্যতিরেকে কিছু নয় তার পূর্বে সব রসূল গত হয়ে গেছে।

বুখারীতে এসেছে যে, এই আয়াত যখন হযরত উমর (রাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শুনলেন তখন তাদের এ রকম মনে হয়েছিলো যে, এই আয়াত আজই অবতীর্ণ হয়েছে আর তাঁদের দৃঢ়-বিশ্বাস হলো যে, প্রকৃতই আঁ হযরত (সাঃ) একজন মানুষ ছিলেন, একজন রসূল ছিলেন এবং আজ পর্যন্ত যত রসূল এসেছেন মানবীয় চাহিদানুযায়ী তারা সবই মারা গেছেন। সেক্ষেত্রে আঁ হযরত (সাঃ) কেন মারা যেতে পারেন না?

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর এই আয়াতের দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তাদের নিকট হযরত ঈসা (আঃ) সমেত সকল নবী-রসূল মৃত ছিলো। যদি ঘটনা এরূপ হতো যে, হযরত ঈসা (আঃ) রসূল হওয়া সত্ত্বেও ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতেন বা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁকে জীবিত মনে করতেন তাহলে তাঁদের সামনে এ আয়াত দলীল-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারতো না আর ঐসব সাহাবা (রাঃ) যারা আঁ হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন তারা অবশ্যই বলে উঠতেন যে, যখন ঈসা (আঃ) রসূল হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন তখন আঁ হযরত (সাঃ)-এর মারা যাওয়া কীভাবে মেনে নেয়া যায়। কিন্তু কোন সাহাবীই কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"এই দলীল যা হযরত আবূ বকর (রাঃ) সকল বিগত নবীদের মৃত্যুর প্রসঙ্গে উপস্থাপন করেছেন উহাকে কোন সাহাবী অস্বীকার করেছেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

অথচ এ সময়ে সকল সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন এবং সকলে একথা শুনে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, এর ওপরে সকল সাহাবার সর্ববাদীসম্মত মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর সাহাবাদের (রাঃ) সর্ববাদী সম্মতমত (ইজমা') চূড়ান্ত দলীল যা কখনও পথভ্রষ্টতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"

(তিরিয়াকুল কুলূব: ২৮৫ পৃষ্ঠা হাশিয়া)

মসীহ (আঃ)-এর মৃত্যু প্রসঙ্গে উম্মতের বুযুর্গানের বক্তব্য

১। হযরত হাসান রাযিআল্লাহু আনহু:

তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে বলেন:

ايها الناس قد قبض الليلة رجل لم يسبقه الا ولون ولا يدركه الا خرون ... ... و لقد قبض فى الليلة التى عرج فيها بروح عيسى بن مريم ليلة سبع و عشرين من رمضان - (طبقات كبير جلد ٣ ص ٢٩)

বঙ্গানুবাদ: হে লোক সকল! আজ রাত্রে এমন একজন লোকের রূহ কবয (মৃত্যু দান) করা হয়েছে যার চেয়ে আগেও কেউ সামনে বাড়তে পারে নি এবং পরেও তার মর্যাদা পেতে পারে না ... ...এবং তার রূহ ঐ রাত্রে কবয করা হয়েছে যে রাত্রে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর রূহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো অর্থাৎ রমযানের ২৭ তারিখ রাত্রে।

(তাবাকাতে কবীর, ৩য় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত হাসান (রাঃ) এ ধর্মবিশ্বাস পোষণ করতেন যে, ২৭শে রমযান তারিখে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আকাশে উত্তোলন করা হয় নি। বরং কেবল তাঁর আত্মাকেই উত্তোলন করা হয়েছে।

২। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু:

'ইন্নী মুতাওয়াফ্ফীকা ওয়া রাফে'উকা ইলাইয়া' আয়াতের তফসীরে লেখা আছে:

قال ابن عباس معناه انى ممتك (تفسير خازن معناه علامه علا الدين على بن محمد جلد ١ ص ٢٨٥) فوز بخرى كتاب التفسر متوفيك ممتك -

অর্থাৎ, হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হলো আমি তোমাকে মৃত্যু দানকারী। (তফসীরে খাযেন, প্রণেতা আল্লামা 'আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৫, আরও বুখারী কিতাবুত্ তফসীর 'মুতাওয়াফ্ফীকা' আয়াতাংশ দ্রষ্টব্য)

৩। ইমাম মালেক রাযিআল্লাহু সম্পর্কে লেখা আছে:

والا كثران عيسى لم يمت و قال مالك مات - (مجمع البحار)

অর্থাৎ, অনেকেই বলেন যে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয় নি কিন্তু মালেক (রাঃ) বলেছেন যে, তিনি মারা গেছেন। (মাজমা'উল বেহার)

৪। ইমাম ইব্‌নে হাযাম (রহঃ)-এর মতবাদ এভাবে লেখা আছে :

تمسك ابن حزم بظاهر الآية و قال بموته - (جلالين زير آيت يعيسى انى متوفيك)

অর্থাৎ, আল্লামা ইব্‌নে হাযাম (রহঃ) আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং তিনি ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী ছিলেন। (জালালাইন, 'ইয়া 'ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফ্‌ফীকা' আয়াত প্রসঙ্গে)

৫। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) লেখেন :

و اما ما يذكر عن المسيح انه رفع الى السماء و له ثلاثة و ثلاثون سنة فهذا لا يعرف له اثر متصل يجب المصير اليه - (زاد المعاد جلد ٢٠ مطبوعة مطبعة الميمنية مصر نيز دكهئے فتح البيان جلد ٢ ص ٤٩ مؤلفه صديق بن حسن القنوجى)

অর্থাৎ, এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বলা হয় যে, তাঁকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর তাঁর বয়স ৩৩ বছর ছিলো—এর কোন ধারাবাহিক সনদ এরূপ পাওয়া যায় না যার দিকে দৃষ্টি দেয়া জরুরী।

(যাদুল মা'আদ পৃষ্ঠা-২০ মুদ্রণে ইয়ামনিয়া ছাপাখানা মিশর, আরও দেখুন ফাতহুল বয়ান ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯, সংকলক সিদ্দীক বিন হাসান আল্‌ কুন্‌জী)

এতদ্ব্যতিরেকে তিনি যাদুল মা'আদ (মিশরী) পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৩০৪ পৃষ্ঠায় লেখেন :

لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مقامه خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حى لا يتألم بذلك عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير اماتة و من سواه لا ينال بذات روحه الصعود الى السماء الا بعد الموت والمفارقة فالانبياء انما استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقة الابدان وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت الى هناك فى حال الحيوة ثم عادت وبعد وفاته استقرت فى الرفيق الاعلى مع ارواح الانبياء -

অর্থাৎ, যেমন রসূলে করীম (সাঃ) অলৌকিক অবস্থায় ছিলেন এমন কি যে, তাঁর পেট চিড়ে ফেলা হলেও তিনি জীবিত অবস্থায়ই ছিলেন আর এতে তাঁর (সাঃ) কোন কষ্ট হলো না এবং পুনরায় হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র আত্মার সাথে প্রকৃত মৃত্যু ব্যতিরেকে তাঁর মে'রাজ সংঘটিত হলো এবং তিনি ব্যতিরেকে আর অন্য কোন ব্যক্তির নিজের আত্মা সমেত আকাশের দিকে আরোহণ কেবল মৃত্যু ও দেহত্যাগের পরেই লাভ হতে পারে। অতএব সকল নবীগণের আত্মা মৃত্যু এবং দেহ-ত্যাগের পরেই আকাশে আরোহণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র আত্মা এ পার্থিব জীবনেই আকাশে আরোহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, পুনরায় ফিরে এসেছে এবং তাঁর (সাঃ) মৃত্যুর পরে রফীকে 'আলা (অতি উচ্চ বন্ধু)-এর নিকটে নবীদের আত্মার সাথে অবস্থান লাভ করেছে।

৬। আল্লামা শওকানী (রহঃ) : আলোচ্য আয়াত 'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী' সম্বন্ধে লিখেন :

قيل هذا يدل على ان سبحانه توفاه قبل ان يرفعه – (فتح القدير قلمى ص ٤)

বঙ্গানুবাদ : বলা হয়েছে যে, এ আয়াত দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, আল্লাহ্‌তা'লা হযরত ঈসা (আ:)-কে আত্মিক উদ্ধরণের পূর্বে মৃত্যু দিয়ে দিয়েছিলেন।

(ফতহুল কাদীর, পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা-৪)

৭। আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে লিখেন :

قال يدل على انه توفاه وفات الموت قبل ان يرفعه – (بحر محيط جز ٢ ص ٤٧١)

বঙ্গানুবাদ : তিনি বলেন যে, এই আয়াত এই কথার ওপরে প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, তাঁকে আত্মিক উদ্ধরণের পূর্বেই মৃত্যু দেয়া হয়েছিলো। (বাহ্‌রে মুহীত : ৪র্থ অধ্যায়, ৬১ পৃষ্ঠা)

৮। আল্লামা জাবাই :

বিখ্যাত শিয়া তফসীরকার আলোচ্য আয়াত 'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী' সম্বন্ধ লিখেন :

وفى هذه الاية دلالة انه اماتت عيسى و توفاه ثم رفعه اليه –

(تفسير مجمع البيان جلد اول زير ايت هذا)

বঙ্গানুবাদ : এই আয়াতে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, আল্লাহ্‌তা'লা ঈসা (আ:)-কে মৃত্যু দিলেন এবং তার পরে তাঁর দিকে আত্মিক উদ্ধরণ করলেন।

(তফসীরে মাজমা'উল বয়ান : ১ম খণ্ড আলোচ্য আয়াত)

৯। শেখুল আকবর মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী (রহ:) 'বাল রাফা'আহুল্লাহু......আল আখের'-এর তফসীর করতে গিয়ে লিখেন :

رفع عيسى عليه السلام اتصال روحه عند المفارقة عن العالم السفلى بالعالم العلوى و كونه فى السماء الرابعة اشارة ان مصدر فيضان روحه روحانية فلك الشمس الذى هو بمثابة قلب العالم و مرجعه اليه و تلك الروحانية نور يحرك ذلك الفلك بمعشوقية و اشراق اشعة على نفسه المباشرة لتحريكه ولما كان مرجعه الى مقره الاصلى ولم يصل الى الكمال الحقيقى وجب نزوله فى اخر الزمان بتعلقه ببدن اخر – (تفسير حضرت ابن عربى ص ٢٥)

বঙ্গানুবাদ : হযরত ঈসা (আ:)-এর আত্মিক উদ্ধরণ-এর উদ্দেশ্য এই যে, দেহত্যাগের সময়ে তাঁর আত্মা আলমে সুফলা (নিম্ন জগৎ) থেকে বের হয়ে আসলে 'উলুই (ঊর্ধ্ব জগৎ)-এর সাথে মিলে গিয়েছিলো। আর তাঁর চতুর্থ আকাশে অবস্থান করার দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, তাঁর (আ:) আত্মার কল্যাণসমূহের প্রকাশের স্থান হলো এ সূর্যের আকাশের আধ্যাত্মিকতা যা এ বিশ্ব জগতের অন্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনস্থলও ঐ দিকে। আর ঐ আধ্যাত্মিকতা একটি জ্যোতি যা কিনা ঐ আকাশকে স্বীয় প্রেম দ্বারা জ্যোতির্ময় করে এবং তাঁর আত্মার ওপরে কিরণসমূহের চমকানো উহারই প্ররোচনায় হয়ে থাকে। এবং যেহেতু হযরত ঈসা (আ:)-এর প্রত্যাবর্তনস্থল উহার আসল নির্ধারিত স্থানের দিকে এবং স্বীয় পরম সত্যতা পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি, এ কারণে তিনি শেষযুগে অন্য কোন সত্তার সাথে অবতীর্ণ হবেন।

[তফসীর হযরত ইবনে আরাবী (রহ:) পৃষ্ঠা-২৫] (চলবে)

মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) সংক্রান্ত ১৮৮৬ সনের

২০শে ফেব্রুয়ারীর

এলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পটভূমি

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁহার প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র—'মুসলেহ্ মাওউদ' সম্পর্ক ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সনে যে এলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেন উহার পটভূমি সুদূর প্রসারী। তারই প্রেক্ষিতে দেখা যায়, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার ইহুদীদের হাদীস গ্রন্থ 'তালমুদে', বাইবেলে সংরক্ষিত ইসাইয়া নবীর কেতাবে, অতঃপর হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হাদীসে এবং তেরশত বৎসর ব্যাপী আউলিয়া ও সুফীগণের কাশ্‌ফ ও এলহামে অনেক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, যাহা—মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত মূল এলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার আনুসঙ্গিক কয়েকটি জরুরী বিষয় পেশ করার পূর্বে—নিম্নে যথাক্রমে দেওয়া হইল :

(১)

(তালমুদ (যোসেফ বার্কলে অনূদিত, ৫ম অধ্যায় পৃঃ ৩৭, ১৮৭৮ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত) গ্রন্থে লিখিত আছে :

"It is also said that he (the Messiah) shall die and his kingdom will discend to his son and grandson. In proof of this opinion Isaiah X111 : 4 is quoted. "He shall not fail, nor be discourged, till he have set judgement in the earth and the lsles shall wait for his law,"

"প্রতিশ্রুত মসীহ মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার (রূহানী) রাজত্বের উত্তরাধিকারী তাঁহার পুত্র তাঁহার পৌত্র হইবেন। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ ইসাইয়া-১৩ : ৪ উদ্ধৃত করা হয়—"তিনি অকৃতকার্য বা নিরুৎসাহ হইবেন না, যে পর্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায়-বিচার স্থাপন করেন ; আর দ্বীপসমূহ তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিবে।"

(২)

চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে হযরত রসূল করীম (সাঃ) উম্মতে আগমনকারী ইমাম মাহদী বা প্রতিশ্রুত মসীহ সম্বন্ধে জগদ্বাসীকে জানাইয়া ছিলেন যে,

يتزوج ويولد له - (مشكوة—باب نزول عيسى ابن مريم)

অর্থাৎ, "তিনি (প্রতিশ্রুত মসীহ্) একটি বিশেষ বিবাহ করিবেন এবং তিনি তাঁহার (মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির) জন্য (বিশেষ প্রতিশ্রুত) সন্তান লাভ করিবেন।' (মেশকাত)

উল্লেখযোগ্য যে, হাদীসের উদ্দেশ্য সাধারণভাবে বিবাহ এবং সন্তান লাভের কথার উল্লেখ হইতে পারে না। তাহা হইলে মসীহ্ মাওউদের সত্যতার লক্ষণাবলীর মধ্যে উহার উল্লেখ বৃথা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং রসূল করীম (সাঃ)-এর জ্ঞানপূর্ণ পবিত্র বাণীতে প্রকৃত-পক্ষে মসীহ্ মাওউদের বিশেষ বিবাহ এবং বিশেষ সন্তান লাভ সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

এই হাদীসের ব্যাখ্যা করিয়া হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বলেন :

"হযরত রসূল করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, মসীহ্ মাওউদ বিবাহ করিবেন এবং তিনি সন্তান লাভ করিবেন, ইহা এই ইঙ্গিত বহন করে যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে বিশেষভাবে একজন পবিত্র পুত্রসন্তান প্রদান করিবেন যে তাহার পিতার সদৃশ্য ও অনুরূপ হইবে, প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহার অনুগত ও অনুগামী হইবে এবং আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ সম্মানিত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম পৃঃ ৫৭৮)।

(৩)

হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ছয় শত বৎসর পর হযরত শাহ্ নে'মাতুল্লাহ্ ওলী (রহঃ) তাঁহার এলহামী কসীদার মধ্যে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে,

دور او چوں تمام بکام - پسرش یادگار مے بینم (اربعین فی احوال المهدیین
مصنفه حضرت اسماعیل شهید (رح)

অর্থাৎ, "আমি দেখিতেছি যে, যখন তাঁহার জীবনকাল সাফল্যের সহিত অতিক্রান্ত হইবে, তখন তাঁহার পর তাঁহার পুত্র তাঁহার পবিত্র স্মৃতিস্বরূপ থাকিয়া যাইবেন।" [আরবাঈন ফি আহওয়ালেল মেহ্‌দঈন, প্রণেতা : হযরত ইস্মাইল শহীদ (রাঃ)]।

(৪)

তেমনিভাবে হযরত মওলানা জালালুদ্দীন রুমী তাঁহার মসনবীতে বলিয়াছেন :

طفل نوزاده شود حبر و فصیح   حکمت بالغ بخواند چوں مسیح
(دفتر ششم ص ۱۲۲ مطبوعه کانپور)

অর্থাৎ "একজন অল্পবয়স্ক বালক অত্যন্ত বিদ্বান, জ্ঞানী ও বাগ্মী হইবে এবং মসীহ্‌র মত তাহার মুখ হইতে মর্মস্পর্শী সূক্ষ্মতত্ত্ব নিঃসৃত হইবে।" (মসনবী, ৬ষ্ঠ দপ্তর)

(৫)

পঞ্চম শতাব্দী হিজরীতে সিরিয়ার একজন উচ্চ পর্যায়ের সূফী হযরত ইমাম ইয়াহিয়া বিন আকাবা (রহঃ) বলিয়াছেন :

و محمود سيظهر بعد هذا ويملك الشام بلا قتال
[شمس المعارف الكبرى (مصرى) ص ٣٤٠]

অর্থাৎ—মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পর "মাহমুদ" আবির্ভূত হইবেন এবং বিনা যুদ্ধে সিরিয়াকে (রূহানীভাবে) জয় করিবেন।" (শামসুল আরেফেল কুবরা, পৃঃ ৩৪০)

উল্লেখ্য যে, মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর নাম এলহাম অনুযায়ী বশীর এবং মাহমুদ রাখা হয়। (সবুজ এস্তেহার ১লা ডিসেম্বর, ১৮৮৮ইং ও এস্তেহার ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

(৬)

১৮৮৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কাদিয়ানের দশজন বিশিষ্ট হিন্দু ব্যবসায়ী ও পণ্ডিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট একটি পত্রের মাধ্যমে আবেদন জানাইলেন যে, 'আপনি ইতিমধ্যে লণ্ডন এবং আমেরিকার অধিবাসীদিগকে বিপুল ইস্তেহার ও রেজিষ্টারী চিঠি প্রেরণ করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন যে, "যদি কোন সত্যিকার সত্যান্বেষী এক বৎসর কাল পর্যন্ত আমার নিকট কাদিয়ান আসিয়া থাকে, তাহা হইলে খোদাতা'লা তাহাকে ইসলামের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ নিশ্চয় এমন অলৌকিক নিদর্শন দেখাইবেন যাহা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বের হইয়া থাকে।"

সুতরাং আমরা আপনার প্রতিবেশী ও একই শহরবাসী হিসাবে লণ্ডন ও আমেরিকা বাসীদের তুলনায় (উক্তরূপ নিদর্শন দেখার) অধিকতর হকদার। তবে, ঐ নিদর্শনাবলী অবশ্য ঐ শ্রেণীর হওয়া চাই যাহা মানবীয় সামর্থ্যের উর্ধ্বে হউক, যদ্বারা প্রতীয়মান হউক যে, সেই সত্য ও পবিত্র পরমেশ্বর আপনার ধর্মীয় সততা ও সত্যপরায়ণতার জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রীতি ও কৃপার পথে আপনার দোয়াসমূহ কবুল করেন এবং দোয়ার কবুলিয়তের পূর্বেই আপনাকে অবহিত করেন অথবা আপনাকে তাঁহার বিশেষ গোপন রহস্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে সেই গোপন রহস্যাবলীর সম্বন্ধে সংবাদ দেন অথবা এমন আশ্চর্যজনক-ভাবে আপনার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষণ করেন, যেভাবে তিনি আদিকাল হইতে তাঁহার মনো-নীত, নৈকট্যপ্রাপ্ত ভক্ত ও বান্দাগণের করিয়া আসিয়াছেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁহাদের এই পত্রটিকে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদনরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তরে জানাইলেন :

"যদি আপনারা সেই সকল অঙ্গীকারে অটল থাকেন যাহা আপনাদের চিঠিতে আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্-জাল্লা শানুহুর সাহায্যে ও পৃষ্ঠ-পোষণে এক বৎসরকালের মধ্যে এমন কোন নিদর্শন আপনাদিগকে দেখান হইবে, যাহা মানুষের সাধ্যের বাহিরে ও মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে হইবে।"

উল্লিখিত হিন্দু মহোদয়দের চিঠিতে নিদর্শন প্রদর্শনের সময়-সীমা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে,

"বৎসরকাল যাহা নিদর্শন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হইয়াছে, উহা ১৮৮৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভ হইতে গণনা করা হইবে এবং উহার পরিসমাপ্তি ১৮৮৬ সনের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ হইয়া যাইবে।"

উভয় পক্ষের উল্লিখিত চিঠি-পত্র লালা অম্পত রায় (যিনি কাদিয়ানস্থ আর্যসমাজ সংস্থার সভ্য ছিলেন) তিনজন সাক্ষীর স্বাক্ষরসহ অমৃতশহরস্থ রেয়াজে-হিন্দ প্রেস হইতে একটি বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(বিস্তারিত বিবরণের জন্য "তবলীগে রেসালত" ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৯—৫৪ পাঠ করুন)

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দুই বৎসর পূর্বে প্রাপ্ত তাঁহার একটি এলহাম—"তেরী উকদাকুশাই হুশিয়ারপুর মেঁ হোগী"—অনুযায়ী কাদিয়ান হইতে হুশিয়ারপুর গমন করিয়া নির্জনে ৪০ দিন আরাধনায় থাকিয়া আল্লাহ্‌তা'লার নিকট বিশেষভাবে দোয়া করেন এবং দীনে-ইসলামের সত্যতা ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য সর্বশক্তিমান খোদার নিকট অপূর্ব নিদর্শন কামনা করেন। উহার উত্তরে আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে তাঁহার নিকট যে সুদীর্ঘ শুভ-সমাচার আসে উহার মধ্যে তাঁহাকে ইসলাম ও আহমদীয়ত সম্বন্ধে অসাধারণ গায়েবের বিপুল সূক্ষ্ম সংবাদ জানান হয় এবং উহার মধ্যেই বিস্তারিত সুসমাচার দেওয়া হয় মুসলেহ মাওউদ তথা মহান সংস্কারক পুত্র সম্বন্ধে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ সকল এলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি প্রচার লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। উহার জরুরী অংশগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :

হযরত আকদস (আঃ) বলেন—

"পরম কারুনিক, পরম দাতা, মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান—যাঁহার মর্যাদা মহাগৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, স্বীয় এলহাম দ্বারা সম্বোধনপূর্বক বলেন :

"আমি তোমাকে এক 'করুণার নিদর্শন' দিতেছি তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী। আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণা সহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ।

নিদর্শনের উদ্দেশ্য ঃ খোদা বলিয়াছেন, যাহারা জীবন প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করে এবং যাহারা কবরের মধ্যে প্রোথিত তাহারা বাহির হইয়া আসে, যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্‌তা'লার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশীষসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান—যাহা ইচ্ছা

করি, করিয়া থাকি এবং যেন তাহাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম ও কেতাব এবং তাঁহার রসূল পাক মুহাম্মদ মুস্তাফাকে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।

মুসলেহ মাওউদের অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলী—

সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই ঔরসজাত তোমারই সন্তান হইবে।

সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে.....।

তাহার সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি এবং 'পবিত্র আত্মার' প্রসাদে বহু জনকে ব্যাধি মুক্ত করিবে। সে কলেমাতুল্লাহ্—আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ, খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহৎ, প্রিয় পুত্র।

مظهر الحق والعلا كان الله نزل من السماء

অর্থাৎ সত্যের বিকাশ-স্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে; জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ-নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে স্বীয় রূহ্ ফুকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায়স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে। و كان امرا مقضيا (অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ্‌র অটল মীমাংসা)।"

(ইস্তেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ ইং)

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ইহাও ঘোষণা করেন যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণসম্পন্ন

মহান পুত্র মাত্র নয় বৎসরের মধ্যে অবশ্যই জন্মলাভ করিবেন। সুতরাং এই নির্ধারিত মেয়াদের ভিতরই তৃতীয় বৎসর—১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে 'শুভ সোমবারে' প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পবিত্র নাম ১৮৮৮ সনের ১লা ডিসেম্বরের ইস্তেহারে প্রাকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ রাখা হয়। তাঁহার জন্মের পূর্বেও এবং জন্মের পরেও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ইলহাম মারফত অবগত হইয়া নির্দিষ্টভাবে তাঁহার সম্বন্ধে ইহা প্রকাশ করেন যে, মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই। তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ আহমদী জমাতের দ্বিতীয় খলীফা হন। তাঁহার ৫২ সাল ব্যাপী সুদীর্ঘ খেলাফত কালীন বিপুল ঘটনাবলী প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি অক্ষর তাঁহার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং তিনি নিজেও আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে ইলহাম প্রাপ্ত হইয়া ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ মাওউদ হইবার দাবী করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ইসলাম-প্রচার কেন্দ্রসমূহ ও বিপুল সংখ্যক উন্নতিশীল জামাত এবং তাঁহার লিখিত কোরআন শরীফের তুলনাহীন অমূল্য তফসীর, জ্ঞান ও তত্ত্বপূর্ণ অসংখ্য পুস্তক, খোৎবা ও বক্তৃতা এবং তাঁহার দ্বারা জামাত ও নেযামে-খেলাফতের দৃঢ়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা জীবন্ত খোদার জীবন্ত নিদর্শনকে চির অম্লান ও সমুজ্জ্বল রাখিতেছে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার স্বাক্ষর হইয়া থাকিবে। ইনশাআল্লাহ্‌।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

সমস্ত প্রসংশা সেই আল্লাহ্‌র যিনি বিশ্বপ্রতিপালক।

(৪৫ পৃষ্ঠার পর)

যদি তোমরা উন্নতি করতে চাও, তোমরা যদি দায়িত্ব সচেতন হয়ে থাকো এবং নিজেদের কর্তব্য সঠিকভাবে সম্যক উপলব্ধি করে থাকো তবে প্রতিটি পদক্ষেপ ও লক্ষ্যে আমার পদাঙ্কানুসরণ করে অগ্রসরমান হও—যাতে আমরা 'কুফরী' অন্তরের গভীর তলদেশে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌'—এর ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিতে পারি এবং অজ্ঞানতার অন্ধত্বকে জ্যোতির্ময় জ্ঞানালোক থেকে চিরতরে নির্বাসিত করতে পারি। ইনশাআল্লাহ্‌ এরূপই ঘটবে—ভূমণ্ডল ও জ্যোতিষ্কের কক্ষচ্যুতি ঘটতে পারে; কিন্তু খোদাতা'লার অমোঘ এ বাণী টলবার নয়।

[১৯৪৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জলসা সালানায় প্রদত্ত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর ঐতিহাসিক আল্‌ মাওউদ শীর্ষক ভাষণ থেকে]

মুসলেহ মাওউদ-এর দাবী

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ

খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

সংগ্রহ ও অনুবাদ : আহমদ তারেক মুবাশ্বের

১। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯৪৪ সনের সম্ভবতঃ ৪-৫ জানুয়ারী তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রে ১৩ টেম্পল রোড, লাহোরস্থ মোকাররম শেখ বশীর আহমদ সাহেব, এডভোকেট এর বাসায় রাত্রি যাপন করেন। ঐ রাত্রেই তিনি এক মহান রু'ইয়ার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তিনিই মুসলেহ মাওউদ। সুতরাং তিনি ২৮শে জানুয়ারী কাদিয়ানের মসজিদে আকসাতে জুমুআর খোৎবায় ঘোষণা করেন :

"আমিই ভবিষ্যদ্বাণীতে উদ্দিষ্ট মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক)।"

(তারীখে আহমদীয়াত : নবম খণ্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা)

২। হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ঐ বছরই ১৬ই এপ্রিল এক জলসা উপলক্ষ্যে দিল্লী গমন করেন। বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতার জবাবে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, "আমি খোদার নিকট থেকে খবর পেয়ে ঘোষণা করছি যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারীর ইশ্‌তেহারে যে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করেন তা পূর্ণ হয়ে গেছে। খোদাতা'লা রুইয়ার মাধ্যমে আমাকে অবহিত করেছেন যে, মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আমিই। যাঁর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া অভিশপ্তদের কার্য আমি সেই লা শরীক খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি, যে রুইয়া সম্পর্কে আমি বর্ণনা করেছি তা খোদা আমাকে অবহিত করেছেন, আমি নিজে তৈরী করিনি। যদি এই বর্ণনায় আমি সত্যবাদী হই এবং আকাশ ও পৃথিবীর খোদা সাক্ষ্য দেন যে, আমি সত্যবাদী, তা'হলে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পরিশেষে একদিন আমি এবং আমার শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কলেমা সারা দুনিয়া পাঠ করবে এবং একদিন আসবে যখন সমগ্র দুনিয়ার উপর এমনভাবে এবং এর চেয়েও অধিক শান-শওকতের সাথে ইসলামের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যেভাবে প্রথম শতাব্দীতে হয়েছিল"।

(তারীখে আহমদীয়াত : নবম খণ্ড, ৬১২-১৩ পৃষ্ঠা)

আল্ মাওউদ খেতাব

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)

অনুবাদ—মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

০ অলসতা পরিহার করুন।

০ দৃঢ় মজবুত পদক্ষেপে তীব্রতার সাথে অগ্রসর হোন।

খোদাতা'লা আমাকে এতদুদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান করেছেন যে, আমি যেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাই এবং ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থিত ভ্রান্ত ও অচল বিশ্বাস ও মতবাদগুলোকে চিরকালের জন্য নিষ্প্রভ ও নিশ্চল করে দিই। জগৎ তার প্রচেষ্টা নিয়োজিত করুক, তার যাবতীয় শক্তি নিচয়, সম্মিলিত জনশক্তি, বিভিন্ন খৃষ্টান রাষ্ট্রির শক্তি এবং তার প্রশাসনসমূহ সংযুক্ত হোক, ইউরোপ ও আমেরিকাও একত্রিত হয়ে যাক, দুনিয়ার সকল বড় বড় অর্থ ও বিত্তশালীগণ মিলিত হোক এবং আমার এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করতে সর্বাত্মকভাবে এগিয়ে আসুক। কিন্তু খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, তারা আমার মোকাবেলায় অকৃতকার্যই থেকে যাবে। খোদাতা'লা আমার দোয়া ও পরিকল্পনার সামনে তাদের যাবতীয় ফন্দি-ফিকিরকে নস্যাৎ করে দিবেন এবং খোদা আমার ও আমার অনুসারীগণণের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বানীর সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। রসূলে করীম (সাঃ)-এর নাম ও মর্যাদার খাতিরে এবং ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে এমনটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। ততদিন পর্যন্ত দুনিয়াকে রেহাই দেয়া হবে না, যতদিন না ইসলাম পুনরায় তার পরিপূর্ণ শান ও মর্যাদার সাথে জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রূহানী জগতের বাদশাহ ও জিন্দা নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গোলামীর চরণে আত্মসমর্পণ না করে।

হে আমার প্রিয়গণ! আমি নিজে না কোন মর্যাদা লাভের জন্য লালায়িত, আর না দীর্ঘ-জীবন লাভের কোন ভরসা রাখি; যদি না খোদা দীর্ঘ জীবন দানের প্রতিশ্রুতি দান করেন—হ্যাঁ, আমি খোদাতা'লার ফযল ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী বটে। এবং আমি দৃঢ় প্রত্যয় রাখি যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামকে পুনরায় আপন ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মান করে তাঁর পদতলে ত্রিত্ববাদকে ধরাশায়ী করার জন্য মহান আল্লাহ্তা'লা আমার অতীত ও ভবিষ্যতের কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মসূচীকে স্বীয় ফযল ও আশিস দ্বারা অনুগৃহীত করবেন। ওই সকল আদর্শ নমুনা ও পরিকল্পনা যা শয়তানের শিরকে পদানত করে ও ত্রিত্ববাদকে সমূলে বিনাশ করে—তাতে আমারও বিশেষ এক ভূমিকা পালনের সৌভাগ্য লাভ হোল, ইনশাআল্লাহ্।

আমি এ সত্য ও প্রকৃত বিষয়টি সমগ্র বিশ্বে খোলাখুলিভাবে পেশ করছি যে, এই আওয়াজ তাঁর—যিনি জমীন ও আসমানের খোদা। এ সেই নির্ধারণী, জমীন ও আসমানের খোদা স্বীয়

মর্জি ও ইচ্ছানুযায়ী যে ফয়সালা গ্রহণ করেছেন। এই বাস্তবতা পরিবর্তিত হতে পারে না—কখনও টলে যেতে পারে না—কক্ষণোই নয়। ইসলামের বিজয় জগতে স্থায়িত্ব লাভ করবেই। ত্রিত্ববাদ জগতে লাঞ্ছিত ও অবমানিতই হতে থাকবে। আজ ত্রিত্ববাদকে আমার হামলার হাত থেকে রক্ষা করতে, পারে এমন কোন অবলম্বন নেই। খোদাতা'লা আমার হাতে একে পরাভূত করবেন এবং তিনি আমার জীবদ্দশাতেই একে এমনভাবে দলিত-মথিত করে দিবেন যে, শিরোত্তলনের তার এতটুকু ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট রইবে না এবং আমার বপিত বীজ থেকে ওই মহামহীরুহের সৃষ্টি হবে যার শাখার দমকা ঝাপ্টায় খৃষ্টিয় মতবাদের শিকড় উৎপাটিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে এবং দুনিয়ার চতুর্দিক থেকে 'আহমদীয়ত' তথা ইসলামের ঝাণ্ডা স্বীয় মর্যাদার সুউচ্চ মিনারে উড্ডীন হতে দেখা যাবে।

এ উপলক্ষ্যে আমি আপনাদিগকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কৃত 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভের সুসংবাদ প্রদানের সাথে সাথে ওই সকল কর্তব্য-কর্ম যা পালনের দায়িত্বাবলী আপনাদের উপর বর্তায়—সে সম্পর্কে আপনাদিগকে অবহিত করাও জরুরী জ্ঞান করি।

আপনারা যারা আমার এই ঘোষণার সাক্ষী ও সম্বোধনের লক্ষ্য তাদের প্রথম কর্তব্য হোল—নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করা এবং ইসলাম তথা আহমদীয়তের সফলতা ও বিজয়ের জন্য দেহের শেষ রক্ত বিন্দু অকাতরে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আপনারা অবশ্যই আনন্দিত হতে পারেন যে, খোদাতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্তা দান করেছেন। আমিও বলছি প্রকৃতই আপনাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। কেননা, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং লিখেছেন যে, তোমরা আনন্দিত হও, খুশীতে উচ্ছ্বসিত হও। কেননা, এরপরই আলোক-প্রভা বিচ্ছুরিত হবে।

অতএব, আমি তোমাদিগকে আনন্দোৎসব পালন করায় বাধা দিই না, বা আনন্দে উদ্বেলিত হওয়া থেকে বিরত রাখি না। তোমরা অবশ্যই উৎসবের সুধানুভূতি লাভ করো। কিন্তু তা বলে আনন্দ-খুশীতে বিভোর হয়ে আপন দায়িত্ব যেন বিস্মৃত না হও। যেমনটি খোদাতা'লা রুইয়ায় আমায় দেখিয়েছেন যে—আমি দ্রুততার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছি এবং ভূমি আমার পদভারে কম্পমান। অনুরূপভাবে আল্লাহ্তা'লা ইলহাম যোগে আমার সম্পর্কে এই খবর দিয়েছেন যে, আমি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করবো। অতএব আমার জন্য এটি নির্ধারিত যে—আমি দৃঢ়তার সাথে দ্রুতময় পদক্ষেপে উন্নতির স্তরসমূহ অতিক্রম করে যাব। কিন্তু সেই সাথে এ-ও আপনাদের দায়িত্ব যে—আপনাদের গতিকে দ্রুততর করুন এবং দুর্বলতা পরিহার করুন। 'মোবারক' তাকে—যে আমার সাথে তার পদক্ষেপ মিলায় এবং ভরপুর আনুগত্যে উন্নতির ময়দানে দ্রুতলয়ে সাথে চলে। এবং আল্লাহ্তা'লা রহম করুন তাকে, অনীহা ও দুর্বলতার কারণে যে দ্রুত পদক্ষেপে ময়দানে অগ্রসর না হয়ে কপট-বিশ্বাসীর ন্যায় পিছু হটে। (অবশিষ্টাংশ ৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রতিশ্রুত পুত্র

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত পুরুষদের কাছে ভবিষ্যতের বহু গোপন তথ্য জানিয়ে থাকেন, যা যথাসময়ে যথাক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করে থাকে। নবীর প্রচারিত এইসব ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হতে দেখা যায় তখন চক্ষুষ্মান মানুষ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে হাক্কুল একীনে উপনীত হন। বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে বিশেষ করে পবিত্র কুরআনে এহেন প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আজকে সেইসব থেকে মাত্র একটি বিষয় নিয়েই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন, রাব্বি হাবলি মিনাস্ সালেহীন, অর্থাৎ হে আমার প্রভু, আমাকে সৎ সন্তান দান কর। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় ইব্‌রাহীম (আঃ) ছিলেন নিঃসন্তান আর বয়সের দিক দিয়েও তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া কবুল করে জানালেন, ফাবাশ্‌শারনাহু বিগুলামিন হালীম (সাফফাতঃ ১০১, ১০২ আয়াত) আর এরপর জন্ম হল ইসমাঈল (আঃ)-এর। শুধু তাই নয় এরপর আল্লাহ্ আরো জানালেন যে, তোমাকে আরো এক পুত্র ইসহাক এবং পৌত্র ইয়াকুবকে প্রদান করা হবে। যথা ফাবাশ্‌শার নাহা বি ইসহাক ওয়া মিউ' ওরায়ে ইসহাকা ইয়াকুব হুদ—৭২) আল্লাহ্ তা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হল তখন মানুষ বুঝতে পারল যে, নিশ্চয় ইব্‌রাহীম (আঃ) যা প্রচার করেছেন তা সত্য। কেননা, পুত্র এবং পৌত্রের জন্মের পূর্বে অবতীর্ণ ঐশীবাণী যখন পূর্ণতা লাভ করেছে তাহলে অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী যা এখনও পূর্ণ হয়নি তা-ও যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ করবে। হিন্দুরাও বিশ্বাস করে যে, শ্রীকৃষ্ণ পুত্র লাভ করবার জন্য তপস্যা করেছিলেন (ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস: ৩য় খণ্ড, ২১০)

উল্লেখযোগ্য যে, আজকাল বহু জ্যোতিষীকে ভাগ্য গণনা করে বা হস্ত রেখা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখা যায়। এইসব ভবিষ্যদ্বাণী থাকে সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের আলোকে যা কখনো পূর্ণ হয় কখনো অপূর্ণ থেকে যায়। এ সবের ব্যর্থতা যাচাই করতে হলে বিগত বৎসরগুলির পঞ্জিকা একত্র করে পাঠ করে দেখুন। এতে দেখতে পাবেন দেশ আর ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণিত ভাগ্যরাশি বা ফলাফল কী নিদারুণভাবে বার বার মার খেয়েছে। জিন্ ডিক্সনের নামে প্রচারিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিরও এই একই দশা। মনে পড়ে ইরানের প্রাক্তন শাহ মোহাম্মদ রেজার রাণী ফারাহ যখন প্রথম সন্তান সম্ভাবা হলেন তখন পৃথিবীর বাছা বাছা নামকরা গণকেরা দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে কেউ বললেন পুত্র হবে কেউ বললেন কন্যা হবে। অবশ্য দু'টির একটি সত্য হয়েছিল। আর এইভাবেই জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে থাকে। জনৈক জ্যোতিষী স্বীকার করেছেন, ভাগ্য

গণনায় বিশ্বাস করি না বরং ভাগ্য গড়ার কাজে পরামর্শ দেই (ইত্তেফাক ৮/১১/৮৭ বাং) কিন্তু আল্লাহ্‌র মা'মুর বা প্রেরিত পুরুষেরা যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন তা অবশ্য অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করে থাকে।

কুদরত ছে আপনি জাত কা দেতা হ্যাঁ হক সবূত
ইস বেনিশাঁ কি চেহরানুমায়ী এহি তো হ্যাঁ
জিস বাত কো কাহে কে করুঙ্গা ইয়ে ম্যাঁ জরুর
টলতি নেহি ও বাত খোদায়ী এহি তো হ্যাঁ।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা পরাক্রমের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে থাকেন আর এভাবেই এই মহান নিরাকার অস্তিত্বের পরিচয় মানুষ পেয়ে থাকে। যখন তিনি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন তা ব্যর্থ হয় না। আর এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়েই খোদা নিজের সত্তার পরিচয় দিয়ে থাকেন। কুরআন শরীফে এ ধরনের আরো বহু ঘটনা বিধৃত হয়েছে। যেমন, যাকারিয়া (আঃ)-কে পুত্র ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, যথা ইয়া যাকারিয়া ইন্না নুবাশ্‌শিরুকা বিগুলামি নিসমুহু ইয়াহ্‌ইয়া। (মরিয়ম ঃ ৮) অন্যত্র আছে, আল্লাল্লাহা ইউবাশ্বিরুকা বি ইয়াহ্‌ইয়া মোসাদ্দেকাম বি কালিমাতিম মিনাল্লাহে ওয়া সাইয়েদাও' ওয়া হাসরাও' ওয়া নবীয়াম মিনাস্‌ সালেহীন। (আলে ইমরান ঃ ৪৬) আল্লাহ্‌র এইসব প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে যথাযথভাবে পূর্ণ হয়েছিল তা ধর্মের ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। এখানে অনেকে প্রশ্ন উঠাতে পারেন যে, এগুলি তো বহু প্রাচীন কালের কথা বা আসাতিরুল আউয়ালিন। এগুলি যে সত্য তার প্রমাণ কি ? এহেন কাহিনী পরবর্তী কালেও রচনা করা হয়ে থাকতে পারে। এর উত্তরে জেনে রাখা দরকার যে, পবিত্র কুরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থ, যার মাধ্যমে জীবন্ত খোদার অস্তিত্ব যুগে যুগে প্রকাশিত হয়ে আসছে। কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী শুধু প্রাচীন কালের বিচ্ছা কাহিনীই নয় বরং সেগুলি ভবিষ্যদ্বাণীও। ফলে তদনুরূপ ঘটনা আজো ঘটছে। এর প্রমাণ আমাদের যুগেও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের সুন্নত অনুযায়ী এমনি এক পুত্র সন্তান লাভের জন্য দোয়া করেছিলেন [অনুরূপ দোয়া হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-ও করেছিলেন] এই দোয়ার কবুলিয়ত স্বরূপ আল্লাহ্‌ আলীমুল গায়েব জানালেন, আর তোমার দোয়াসমূহকে আমার রহমতের দ্বারা যথাযথ কবুলিয়াত প্রদান করেছি। .....খোদা এই কথা বলেন, এজন্য যে, যারা জীবনের প্রত্যাশী তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায় আর যারা কবরে তারা যেন তা থেকে বহির্গত হয়। এবং ইসলাম ধর্মের সম্মান ও কালামুল্লাহ্‌র মর্তবা যেন লোকদের কাছে প্রকাশ পায় আর সত্য তার সমস্ত কল্যাণ-সহ আগত হয় আর মিথ্যা যেন সর্ব প্রকার অকল্যাণসহ পলায়ন করে। আর লোকেরা যেন বুঝতে পারে আমি সর্বশক্তিমান। যা চাই তাই করতে পারি। আর ওরা যেন এ-ও বুঝতে

পারে যে, আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি। যারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং খোদা, তাঁর ধর্ম, কিতাব এবং পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে অস্বীকার করে এবং মিথ্যা জ্ঞান করে তাদের জন্য যেন এটি স্পষ্ট নিদর্শন হয়। তৎসঙ্গে অপরাধীদের শাস্তির পথও যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। অতএব তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন পবিত্র পুত্রের, এক মেধাবী গুলাম (পুত্র) তুমি লাভ করবে (সূরা সাফ্‌ফাত এবং মরিয়মেও 'গুলাম' শব্দ রয়েছে) এই ছেলে তোমারই সন্তান এবং তোমারই ঔরসজাত হবে। .....তাকে রূহুল কুদুস প্রদান করা হয়েছে, অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সে আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ। ধন্য সে, যে আকাশ থেকে আসে। তার সঙ্গে ফযলের আবির্ভাব হবে। সে পৃথিবীতে এসে তার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে কালেমাতুল্লাহ্‌ (ইয়াহিয়া ও ঈসার জন্যও 'কালিমা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) কেননা, খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হালীম বা স্নায়বান (সূরা সাফ্‌ফাতে অনুরূপ হালীম পুত্রের কথা আছে) ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হবে। জাগতিক ও ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। .....সোমবার শুভ সোমবার, সম্মানিত মহৎ প্রিয় পুত্র, আদি অন্ত, সত্য এবং মাহাত্ম্যের বিকাশস্থল, যেন আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে অবতরণ করলেন (অর্থাৎ দোয়ার কবুলিয়তের বিকাশস্থল, যেন আল্লাহ্‌ জগদ্বাসীর কাছে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিলেন) তার আগমন অশেষ কল্যাণ, ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে জ্যোতিঃ। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ-নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। তার মধ্যে রূহ ফুৎকার করা হবে, তার শিরে খোদার ছায়া বিরাজমান থাকবে, সে শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করিবে। বিভিন্ন জাতি তার মাধ্যমে আশীষপ্রাপ্ত হবে (ইস্তেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬) এই প্রতিশ্রুত পুত্রের নাম মাহমুদ এবং বশীর হবে (সবুজ ইস্তেহার, ১লা ডিসেম্বর, ১৮৮৮) মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ আর একটি ঐশীবাণী হল, ইন্না মুবাশ্বিরুকা বিগুলামিন মাজহারিল হাক্কে ওয়াল উলা কাআন্নাল্লাহা নাযালামিনাস্‌ সামায়ে। ইন্না মুবাশ্বিরুকা বিগুলামিন নাফেলাতাল্লাক (তাযকেরা, ৬৫১) অর্থাৎ তাঁকে এক পুত্র এবং পৌত্রের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যেভাবে সূরা হূদে ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে পুত্র ও পৌত্রের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) ও নিজেকে ইব্‌রাহীমের মসীল বলে দাবী করেছেন। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এ সম্বন্ধে ভবিষদ্বাণী ছিল। হাদীসে আছে, ইয়াতা জাউয়াজু ওয়া ইউলাদুলাহু (মেশকাত) অর্থাৎ মসীহ মাওউদ (আঃ) এক বিশেষ বিবাহের মাধ্যমে এক বিশেষ পুত্র লাভ করবেন। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে আছে It is said that he (The Messiah) shall die and his

Kingdom descend to his son and grandson (Talmud Ch, V. Page 37, London Edition, 1878) অন্যান্য অলী আল্লাহ্‌রাও বলে গেছেন, ও মাহমুদা সাইয়াজহেরু বাদা হাযা (শামসুল মারেফুল কুবরা) অর্থাৎ মাহদী (আঃ)-এর পর মাহমুদ জাহের হবেন। নিয়ামত উল্লা অলীও বলে গেছেন, দোড়ে ও চুঁওদ তামাম বকাম, পেশ রশে ইয়াদগারে মেবিনাম—অর্থাৎ আলিফ হে মিম দাল মে খোয়ানম বা আহমদ (আঃ)-এর পর তাঁর এক বিশেষ পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। মাহদী (আঃ)-এর এই পুত্রের কথা বিহারুল আনওয়ার, জিলদ-১৩, ২৩৬ পৃষ্ঠায়ও আছে। ৮ম হিজরী শতাব্দীর বযুর্গ সৈয়দ সদরুদ্দীন তাঁর তোহাফায়ে নসায়ী পুস্তকে লিখে গেছেন যে, মসীহ মাওউদের পর কৃষক এবং মজদুরদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তখন ধর্মের নেতা মাহমুদ হবেন (১২ পৃঃ)। অনুরূপ ৭ম হিজরী শতাব্দীর ইমাম হাফেয আবু আবদুল্লাহ্‌ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আল কুরশি তাঁর কাফাইয়াতুত তাল্‌ব পুস্তকে লিখে গেছেন আখেরী জামানায় এমন এক ব্যক্তির উদ্ভব হবে, যে কাল পতাকাগুলিকে লাল বর্ণের পতাকায় পরিণত করবে। ঐ সময় নবী মাহদীর প্রতিশ্রুত পুত্রের যুগ হবে (৫০৪ পৃঃ) বিহারুল আনওয়ার এ আছে, ফাইনদাহা ইয়াযহারু ইবনাহাবীইল মাহদী (জিলদ-১৩ পৃঃ ৪০)। কোন কোন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস মতে প্রতিশ্রুত মসীহ ১৮৭৩ এ আগমন করে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তাঁর সংগঠনকে দৃঢ় করবেন এবং পরে মনোনীতদেরকে একত্রিত করবেন (Millennial Dawn. Edn. 1889)। আশ্চর্যনীয় বিষয় এই যে, পুস্তকটি যে সালে প্রকাশিত হয় সেই সালেই অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ সালে খলীফার দায়িত্বভার গ্রহণ করে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর খিলাফত লাভের তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কৃষকরাজ, শ্রমিক রাজ কায়েম হয় এবং সেখানে লাল ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়। এই মেধাবী ও প্রতিভাধর মহাপুরুষের দীর্ঘ ৫২ বৎসর খিলাফত কালের কর্ম বিবরণী এখানে পেশ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তিনি পবিত্র কুরআনের যে দু'খানা অমূল্য তফসীর রচনা করে গেছেন তা নিঃসন্দেহে জগতে অদ্বিতীয়। তাঁর রচিত বিভিন্ন পুস্তকাবলী পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে সমগ্র জগতে ইসলামের আলো বিকিরণ করছে। তাঁর সাংগঠনিক শক্তির ফলে পৃথিবীর বহু দেশে মিশন এবং মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের অগণিত নর-নারী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়েছে।

ভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার। খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুলবয়ান (কুরআন)। প্রত্যেক নবী তাঁর জাতির ভাষায় প্রচার কার্য চালিয়ে গেছেন (কুরআন)। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) মাতৃভাষায় দোয়া করতে এবং খুৎবা দিতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বাংলা সম্বন্ধে তাঁর একটি

ঐশীবাণী হল, 'বাঙ্গালীদের মনোরঞ্জন করা হবে' (তাযকেরা) নানাভাবে এটি পুর্ণ হয়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রহিত হয়ে, বাংলাভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়েও এটি পুর্ণতা লাভ করেছে। ঐশীবাণীতে বর্ণিত 'বাংলা' শব্দটি কিয়ামতকাল পর্যন্ত উজ্জল হয়ে থাকবে। এখন আর এটিকে কখনও মুছে ফেলা যাবে না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর পরই আহমদী জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কয়েকটি নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা করেছিলেন, তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেছিলেন, মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোক, এ সম্বন্ধে পুর্ব পাকিস্তানের উপর যেন উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে কিন্তু এটি পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা, ওখানকার অধিবাসীদের বাংলা ভাষার জন্য এক বিশেষ ভালবাসা রয়েছে (মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ কৃত তারিখে আহমদীয়্যত, আল ফযল, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ইং থেকে উদ্ধৃত) যুগের মহামানবের এই দূরদর্শিতা ও ভবিষ্যদ্বাণী কীরূপে সত্য হয়েছে তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এমন এক সময় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যখন এ ব্যাপারে কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা, উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" সেই থেকেই শুরু হল ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালীরা বুকের রক্ত দিয়ে প্রমাণ করল যে, তারা মাতৃভাষাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। এই ভাষা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পুর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ১৯০৫ সালে ঘোষণা করলেন, জার ভি হোগা তো হোগা উস ঘড়ি বহালে জার (তাযকেরা, ৫৪০ পৃঃ)। অর্থাৎ অচিরেই জারের জন্য (রাশিয়ার সম্রাট) ক্রন্দন বা বিলাপের অবস্থা সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ তার এমন শোচনীয় পরিণতি হবে যে, জগদ্বাসী তা দেখে দুঃখে মাতম করবে। মহাপ্রতাপশালী, বিপুল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী রাশিয়ার সম্রাট এই ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র বার বৎসর পর অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে সপরিবারে পাত্র মিত্র সহ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে তা তখন কারো কল্পনাতে আসে নি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ১৯১৮ সালের ১৬ই জুলাই ইকাতেরিনবার্গে জারকে তার পরিবার পরিজন সহ হত্যা করা হয় এবং এক অজ্ঞাত স্থানে তাদেরকে মাটি চাপা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। লেলিনের জীবনীতে বলা হয়েছে, "মধ্য রাত্রিতে তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে কাপড় পরে নিবার নির্দেশ দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে নির্দিষ্ট কক্ষে যেতে বলা হয়।.....তারপর তারা সকলে সেখানে গেলে মৃত্যুদণ্ডের আদেশটি পড়ে শোনান হয়। আদেশটি পঠিত হবার পর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে

নিকোলাস, তাঁর পত্নী, পুত্র এলেকিস, চার কন্যা এবং রাজ পরিবারের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত সকলকে গুলী করে হত্যা করা হয়।.....ইউরাল সোভিয়েটের সদস্য যুরোভস্কির নেতৃত্বে একদল চেক সৈন্য জার পরিবারের বধকার্য সমাধা করে। হত্যার পর শবগুলো কুঠার দ্বারা টুকরো টুকরো করে খণ্ডিত অংশগুলো বেনজিন সালফিউরিক এসিডে ভিজিয়ে নেয়া হয় তারপর সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। হাড়গোড় যা অবশিষ্ট থাকে তা খনি থেকে কিছু দূরে একটি জলাভূমিতে নিক্ষেপ করে সেটি ভরাট করে ফেলা হয় (ডেভিড শাব লিখিত লেলিনের জীবনী, ২৩৭ পৃ।)।

জারকে হত্যার পরের রাত্রিতে ইউরালের আর একটি শহরে জারের পরিবারের আরো সাত জনকে গুলী করে হত্যা করা হয়। এর আগে পারম এ গ্রাণ্ড ডিউক মিখাইলকে গুলী করে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পর সারা দেশময় শত্রুদের বিরুদ্ধে চলতে থাকে নির্মম অভিযান (ঐ ২৮৩ পৃষ্ঠা)।

জারের জার জার হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করল। শুরু হল কমিউনিজমের নামে একনায়কত্বের শাসন। বলশেভিক নেতাদের ইচ্ছাই তখন দেশের সর্বোচ্চ আইন। লেলিনের পর ক্ষমতায় এলেন লৌহ মানব ষ্ট্যালিন। রাশিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সারা পৃথিবী থেকে। মুক্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন লৌহ যবনিকার অন্তরালে। ক্রমশঃ মার্কসবাদ, লেলিনবাদ এবং ষ্ট্যালিনবাদ ছড়িয়ে গেল পৃথিবীর নানা দেশে। কমিউনিজম তখন পৃথিবীর এক বিস্ময়। দিনে দিনে এর প্রসার আর প্রতিপত্তি জগদ্বাসীকে চমক লাগিয়ে দিল পতন ঘটল বহু দীর্ঘস্থায়ী শাসন ও শাসকের। এক কথায় কমিউনিজমের নামে সমাজতন্ত্রের সূর্য তখন মধ্য গগনে।

১৯৪৫ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবী জর্জরিত তখন রাশিয়ার প্রভাব বলতে গেলে একদম তুঙ্গে। বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রদীপ একে একে নিভে যাচ্ছে। তখন আহ্‌মদী জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা ঘোষণা করলেন,—"বলশেভিজমের বর্তমান প্রশাসন নিয়ে ভেবে দেখার কিছু নেই, এটি এখন জারের অত্যাচারের কথা স্মরণ রেখেছে। যেদিন এই বিশ্বাস অন্তর থেকে মুছে যাবে.....তখন নূতন প্রজন্ম বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং এই শিক্ষার স্বরূপ তখন প্রকাশ হয়ে পড়বে, যা দেখে সমগ্র জগৎ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে (নেযামে নও: ৮৩ পৃ:)। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "লোকে মনে করে কমিউনিজম জয়যুক্ত হয়ে গেছে অথচ এই বিজয় একমাত্র জারের অত্যাচারের ফল। যখন পঞ্চাশ ষাট বৎসর গত হয়ে যাবে, যখন এর চিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন যদি এই ব্যবস্থা জয়যুক্ত থাকে, তখন আমি মনে করব যে, কমিউনিজম সত্যি সত্যিই জয়যুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই যান্ত্রিকতা দীর্ঘ দিন চালু থাকতে পারে না। সময় আসবে যখন মানুষ এই যান্ত্রিকতাকে ভেঙ্গে-

চূরে রেখে দেবে (ইসলামকা ইকতেসাদী নেযাম: ৮৫ পৃঃ)। তিনি বলেছেন, "এই সাম্যবাদী আন্দোলনের অধঃপতন ভয়ানক হবে" (নেযামে নও: ৩৯ পৃঃ)। আজ রাশিয়া তথা সমগ্র পূর্ব ইউরোপের তথাকথিত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পতন ও পরিবর্তন লক্ষ্য করে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান হয়ে ধরা পড়ছে। জারের সৌভাগ্য রবি যখন মধ্যগগনে তখন জারের পতন ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। অপরদিকে কমিউনিজমের পূর্ণ প্রতাপের যুগে ঘোষিত হয়েছিল এর বেদনাদায়ক পরিণতির কথা, যা আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। জগত আশ্চর্য হয়ে দেখছে কীভাবে সমাজতন্ত্রের প্রদীপ একে একে নিভে যাচ্ছে। কোথাও বা তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে নিভু নিভু হয়ে আছে। তথাকথিত কমিউনিষ্ট দেশগুলির শহর নগর থেকে লেলিনের মূর্তিগুলিকে মানুষ উল্লাসের সঙ্গে ভেঙ্গে ফেলছে।

আহমদী জামাতের দ্বিতীয় খলীফা এ-ও ঘোষণা করলেন, "এই দেয়াল ভেঙ্গে যাবে এবং জগৎ এক জবরদস্ত পরিবর্তন দেখতে পাবে" (ইসলামকা একতেসাদী নেযাম)। এই দেয়াল বলতে তো একমাত্র বার্লিন দেয়ালকেই বুঝি। এই দেয়াল ১৯৬১ সালের ১৩ই আগষ্ট নির্মিত হয়েছিল। আজ তা ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে গেছে। মাত্র ২৯ বৎসরে কী বিরাট পরিবর্তন। কোন বস্তুবাদী কি এক বৎসর পূর্বেও এমনটি ভাবতে পেরেছিল? না, এ ধরনের ভাবনা বস্তুবাদের আওতাভুক্ত নয়। একমাত্র ঐশীবাণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই একথা বলতে পারেন। আল্লাহ্ আলেমুল গায়েব, যাদেরকে জানিয়েছেন বা যাদেরকে দূরদৃষ্টি দিয়েছেন একমাত্র তারাই এ হেন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। জগৎ যা ভাবতে পারে না, মানুষ যা কল্পনা করতে পারে না ঐশী-আলোকপ্রাপ্ত পুরুষেরা তা দিব্য-দৃষ্টিতে দর্শন করে থাকেন। আর এখানেই ধর্ম ও জড়বাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য।

এই আলোচনায় আরো একটি বিষয় উল্লেখ না করলে এ ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, "আমি আমার জামা'তকে রাশিয়ায় বালুকণার ন্যায় দর্শন করেছি" (তাযকেরা, ৮১৩ পৃঃ)। এ থেকে জানা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র রাশিয়ায় আহমদী জামাত বিস্তার লাভ করবে। ১৯০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী তাঁকে রুইয়ার মাধ্যমে দেখানো হয় যে, জারের রাজদণ্ড তাঁর হাতে অর্পণ করা হয়েছে (তাযকেরা: ৪৫৮ পৃঃ)। এ থেকেও জানা যায় যে, রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা জামাতের নিয়ন্ত্রণে আসবে। এই আলোচনায় বিশেষ করে শেষ বক্তব্যে হয়ত কেউ আশ্চর্য বোধ করছেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এই অসম্ভব কি করে সম্ভবে পরিণত হবে। হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। বস্তুবাদী জড়বাদী চেতনায় এটি বোধ-গম্য নয়। আপাতদৃষ্টিতে যা কল্পনাবিলাস, অবাস্তব মনে হচ্ছে, যার পূর্ণতার কোন লক্ষণই এখন দৃশ্যমান নয়, তা কি করে একজন বস্তুবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে? কিন্তু যারা ঐশীবাণীর উপর ঈমান ও একীন রাখেন, তারা জানেন যে অবশ্য-অবশ্যই তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। যে আলীমুল গায়েব আল্লাহ্ বহু বৎসর পূর্বে জারের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর প্রেরিত পুরুষকে জানিয়েছিলেন, যে মহান সত্তা তাঁর প্রিয় বান্দাকে কমিউনিজম ও সোশিয়ালিজমের পতন সংবাদ জ্ঞাত করিয়েছিলেন, শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীও সেই একই সত্তা থেকে

(অবশিষ্টাংশ ৫৫ পাতায় দেখুন)

এক নজরে মাহমুদ চরিত

সংকলন : মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

১৮৮৪ সালের প্রথম দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক এক অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন সন্তান জন্ম হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী।

১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী এক বিশেষ প্রচারপত্র দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা।

১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বর হযরত মাহমুদ (রাযিঃ)-এর জন্ম সম্বন্ধে 'সবুজ ইস্তেহার' প্রকাশ।

১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী, 'সোমবার' মাহ্মুদের জন্ম।

১৯০৬ সালে তাশহীযুল আযহান সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সালে একই নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাহমুদ উহার সম্পাদক হন। সালানা জলসায় সর্বপ্রথম বক্তৃতা করেন। বিষয় ছিল 'শেরেকের মূলোৎপাটন'।

১৯০৭ সালে ঐ পত্রিকা মাসিকে রূপান্তরিত হয়।

১৯০৮ সালের ২৬শে মে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ওফাত। মাহ্মুদের প্রতিজ্ঞা যে, কখনও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আদর্শ হতে দূরে যাবেন না।

হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর খেলাফত লাভ।

১৯১১ সালে মাহ্মুদ কর্তৃক আঞ্জুমানে আনসারুল্লাহ্র প্রতিষ্ঠা।

১৯১৩ সালের ১৮ই জুন প্রথম 'সাপ্তাহিক আল্ ফযল' প্রকাশিত। পরে ইহা দৈনিকের রূপ নেয়।

১৯১৪ সালের ১৩ই মার্চ শুক্রবারে হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ)-এর ওফাত।

১৪ই মার্চ হযরত মাহমুদ দ্বিতীয় খলীফারূপে নির্বাচিত হন। মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ মাহমুদের হাতে বয়াত গ্রহণ করতে বিরত থাকেন।

১৯১৫ সালে মিনারাতুল মসীহ্ নির্মাণের স্থগিত কার্য সম্পন্ন করেন। কাজী আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে মোবাল্লেগ রূপে লণ্ডন প্রেরণ।

১৯১৬ সালে ১ম পারা কুরআনের উর্দু ও ইংরাজী তরজমা ও তফসীর প্রকাশ।

১৯১৭ সালে হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবকে মুবাল্লিগরূপে লণ্ডন প্রেরণ।

১৯১৮ সালে জীবন ওয়াকফের তাহ্রীক প্রবর্তন।

১৯১৯ সালে হযরত মাহমুদ কর্তৃক বিভিন্ন নেযারতের প্রতিষ্ঠা।

১৯২০ সালে আমেরিকায় হযরত মুফতী মোহাম্মাদ সাদেক সাহেবকে প্রথম মুবাল্লিগ

হিসাবে প্রেরণ। খেলাফত আন্দোলনে ও অসহযোগ আন্দোলনে প্রকৃত পথ-প্রদর্শন।

১৯২১ সালে মৌলবী আবদুর রহীম নাইয়ার সাহেবকে পশ্চিম আফ্রিকায় প্রেরণ ও বার্লিনে মৌলবী মোবারক আলী (বাঙ্গালী) সাহেবকে প্রেরণ।

১৯২২ সালে মজলিসে শূরা ও লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা।

১৯২৩ সালে মালকানা ক্যাম্পেইন পরিচালনা; মিশরে শেখ মাহ্মুদ ইরফানী সাহেব কর্তৃক তবলীগ কার্য আরম্ভ।

১৯২৪ সালে লণ্ডন সফর। আহমদীয়ত অর দি ট্রু ইসলাম (Ahmadiyyat or The true Islam) পুস্তক প্রকাশ।

লণ্ডন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

১৯২৫ সালে মেয়েদের মাদ্রাসা স্থাপন।

১৯২৭ সালে ধর্ম-নেতাগণের সম্মান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, মুসলমানদের আর্থিক উন্নতির আন্দোলন।

১৯২৮ সালে 'রঙ্গিলা রসূল' প্রবন্ধের উত্তরে জামাতকে বাৎসরিক 'নবী দিবস' প্রতিপালনের নির্দেশ। জামেয়া আহ্মদীয়ার প্রতিষ্ঠা।

১৯২৯ সালে নুসরত গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা।

১৯৩০ সালে সাইমন কমিশন রিপোর্টের সমালোচনা করিয়া রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের প্রতিনিধির নিকট পুস্তক প্রেরণ।

১৯৩১ সালে কাশ্মীর কমিটির প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

১৯৩৩-৩৪ সালে আহরারী ফেৎনার উদ্ভব ও তাহ্রীকে জাদীদের পত্তন।

১৯৩৭ সালে মৌলবী আবদুর রহমান মিশরীকে জামাত হতে বহিষ্কার।

১৯৩৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মজলিস খোদ্দামুল আহ্মদীয়া এবং আতফালুল আহ্মদীয়া প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৯ সালে খেলাফত জুবিলী উৎসব উদযাপন: জামাতকে 'সর্ব ধর্ম প্রবর্তক দিবস' প্রতিপালনের নির্দেশ দেন। জামাতের পতাকা, খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার পতাকা উত্তোলন।

১৯৪১ সালে ফযলে ওমর গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা; ডালহৌসীতে তাঁর বাসভবনে পুলিশের অন্যায় আচরণ। পবিত্র স্থানগুলি হেফাযতের জন্য লাহোর রেডিও ষ্টেশনে বক্তৃতা।

১৯৪২ সালের ২৯শে মে প্রথম ওয়াকারে আমল আন্দোলন এবং স্বয়ং যোগদান।

১৯৪৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী হুশিয়ারপুরে মুসলেহ্ মাওউদ হইবার দাবী করেন।

১৯৪৫ সালে ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ইসলামের তবলীগ সম্প্রসারণের জন্য একদল মোবাল্লেগ প্রেরণ।

১৯৪৫ সালে 'হিল্‌ফুল্‌-ফুজুল' তাহরীক পুনরুদ্ধার।

১৯৪৬ সালে বিশ্বের আটটি বিখ্যাত ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ সমাপ্ত হওয়ার ঘোষণা।

১৯৪৬ সালে ফযলে উমর রিসার্চ ইনিস্‌টিটিউট-এর ভিত্তি স্থাপন।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে কাদিয়ান হতে হিজরত।

১৯৪৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর আহমদীয়তের নতুন কেন্দ্র রাবওয়ার ভিত্তি স্থাপন।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে রাবওয়াতে প্রথম সালানা জলসা। কুরআন করীমের ইংরেজী তফসীরের ভূমিকা ও প্রথম ১০ সিপারা প্রকাশিত।

১৯৫২—৫৩ সালে পাঞ্জাব দাঙ্গা এবং হযরত মাহমুদ (রাঃ)-এর সাফল্যজনক নেতৃত্ব।

১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চ আততায়ীর ছুরিকায় আহত।

১৯৫৫ সালে কুরআন করীমের ডাচ ভাষায় তরজমা প্রকাশ।

১৯৫৫ সালে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য ইউরোপ সফর ও সেখান হতে প্রত্যাবর্তন।

১৯৫৬ সালে খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দরুন মৌলবী ওহাব ওমর, মৌলবী মান্নান ও আরো ১২ জনকে জামাত হতে বহিষ্কার।

১৯৫৭ সালে 'তফসীরে সগীর' (কুরআন শরীফের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর) প্রকাশ।

১৯৫৭ সালে তাহরীক ওয়াকফে জাদীদের পত্তন।

১৯৫৯ সালে জার্মান ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

১৯৬০ সালে নিগরান বোর্ড গঠনের মঞ্জুরী দান।

১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় খেলাফতের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট জামাতের বিশেষ দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

১৯৬৫ সালের ৮ই নভেম্বর বাঙলাদেশ সময় ভোর ৩টা ২০ মিনিটে পরলোক গমন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)

(৫২ পাতার পর)

উচ্চারিত। অতএব যিনি জগতের কাছে অসম্ভব বলে স্বীকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর দু'টি অংশকে পূর্ণ করেছেন তিনি যথাসময়ে এর তৃতীয় অংশটিও পূর্ণ করে জগদ্বাসীর সম্মুখে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দেদীপ্যমানরূপে উপস্থাপন করবেন।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে রাশিয়াসহ অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি স্থানে আহমদীয়া জামাত কর্তৃক মিশন স্থাপিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই বহুলোক আহমদীয়ত গ্রহণ করে জামাত কায়েম করেছে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এক রুইয়াতে উম্মে তাহের (রাঃ)-কে এক পুত্র কোলে নিয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করতে দেখেন (খুতবা ২৩/২/৯০ দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখ্য যে, উম্মে তাহের মরিয়ম বেগম সাহেবা (রাঃ)-এর পুত্রই হলেন বর্তমান চতুর্থ খলীফা মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। এই রুইয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত তাহের (আইঃ)-এর যুগে রাশিয়ায় ইসলাম প্রসার লাভ করবে।

যাকাতের গুরুত্ব এবং অবস্থাপন্নদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বর্তমানে জামাতে আহমদীয়া ছাড়া আর কারো বায়তুল মালের নেযাম নেই। যারা ইসলামের কথা বলেন—তারা সবাই শুধু বক্তৃতা সর্বস্বই নন—তাদের অনেকেই সঠিকভাবে জানেনও না যে, যাকাত ব্যবস্থা কেন জারী করা হয়েছে এবং যাকাতের অর্থ কোথায় কার কাছে দিতে হবে। আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা যেমন যামানার ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে মানতে পেরেছি—তেমনি বর্তমানে আমাদের মধ্যে খেলাফতের নেযাম ও বায়তুল মালের নেযাম কায়েম রয়েছে।

যাকাত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে বলেন—

"এবং তোমরা নামাযকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিও ও যাকাত দিতে থাকিও, আর তোমরা নিজেদের কল্যাণের জন্য পূর্ব হইতে যে-সব সৎকর্মের সংস্থান করিয়া রাখিবে—আল্লাহ্‌র নিকট উহার সুফল লাভ করিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সকল কর্ম অবলোকন করেন"।

(সূরা বাকারা: আয়াত ১১১)

যাকাত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলেছেন: "যে অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে না তার ধন-সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে আর উত্তপ্ত শলাকা দ্বারা তার কপালে ও মুখমণ্ডলে সেঁক দেয়া হবে এবং এ শাস্তির মেয়াদ ৫০ বছরের সমান হবে"। (মিশকাত)

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো যাকাত। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উক্ত নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করা প্রত্যেক আহমদী বিশেষ করে অবস্থাপন্ন আহমদীর একান্ত কর্তব্য।

আমরা জামাতের অবস্থাপন্ন সদস্যদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের কাছে প্রদত্ত যাকাতের অর্থ থেকে বেশ কিছু অক্ষম ও দরিদ্র পরিবারকে মাসিক অযিফা দেয়া হচ্ছে। তাছাড়াও কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে গরীবদের সাহায্যও করতে হয়। যাকাতের উদ্দেশ্য মোতাবেক জামাতের সহায় সম্বলহীনদেরকে উপার্জনে সক্ষম করে তোলা আমাদের কর্তব্য—কিন্তু আমরা আজও সে পর্যায়ে পৌঁছুতে পারি নি।

তাই জামাতের অবস্থাপন্ন সদস্যদের খেদমতে আমাদের বিশেষ অনুরোধ—যাদের ওপরে যাকাত আদায় করা ফরয, তারা তাদের সম্পদের যাকাত যুগ-খলীফার প্রতিনিধি ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে আসন্ন রমযান মাসেই পেশ করবেন (যেহেতু রমযান বিশেষ কল্যাণ ও পুণ্য অর্জনের মাস), যাতে আপনাদের এ অর্থ জামা'তের নিঃস্ব ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা যায় ও ঈদের আনন্দে তারা শরীক হতে পারেন।

আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সম্পদে সকল প্রকার বরকত দান করুন, আমীন।

গিয়াস উদ্দীন আহমদ
এডিশনাল সেক্রেটারী ফাইনান্স
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

বিয়ে-ফরম সম্বন্ধে নির্দেশাবলী

[নাযারাতে ইসলাহ ও ইরশাদ কর্তৃক প্রবর্তিত এবং সকল আহমদী কর্তৃক পালনীয়। নাযারাতে ইসলাহ ও ইরশাদ কর্তৃক প্রবর্তিত বিয়ে-ফরমও বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। এখন থেকে আহমদীদের বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে এ ফরম ব্যবহার করতে হবে—ন্যাশনাল আমীর]

১। আপন পিতাই কনের অভিভাবক।

২। যদি পিতা বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারেন তাহলে কাউকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করা উচিত। কিন্তু অভিভাবক হিসেবে কনের পিতাই স্বয়ং স্বাক্ষর করবেন। এজন্যে বিয়ে-ফরমে একটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বরও একজনকে তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত করতে পারেন, যদি তিনি বিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারেন। এজন্যেও বিয়ে ফরমে একটি স্থান নির্ধারিত রয়েছে।

৩। কনের পিতা যদি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে এসব আত্মীয় পর্যায়ক্রমে সুস্থ জ্ঞান-সম্পন্ন সাবালিকা কনের জন্যে অভিভাবক হতে পারেন; দাদা, আপন ভাই, সৎভাই, চাচা এবং পিতার পক্ষের এরূপ কোন নিকটাত্মীয়।

৪। প্রস্তাবিত বরের ছয়মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত আয়ের ওপরে দেন মোহর নির্ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছেন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)। এ নির্দেশনা অবশ্যই পালন করা উচিত।

৫। 'তালাক' (স্বামী কর্তৃক বিয়ে-বিচ্ছেদ) বা 'খোলা' (স্ত্রী কর্তৃক বিয়ে-বিচ্ছেদ)-এর পর যদি দ্বিতীয় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় সেক্ষেত্রে বিয়ে-ফরমের সাথে বিচ্ছেদ সংক্রান্ত কাগজ পত্র গ্রথিত থাকতে হবে। এসব কাগজ পত্রে উভয় পক্ষ থেকে পূর্ণ দেনা-পাওনা আদায়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। ইহা দুইজন সাক্ষী এবং স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৬। রাবওয়াতে বিয়ে অনুষ্ঠান সংঘটিত হলে, রাবওয়াস্থ ইসলাহ ও ইরশাদ বিভাগের অধীনস্থ বিয়ে অফিসের অনুমতি নিতে হবে। আর কনের অভিভাবক এবং কনের সম্মতিসহ সাক্ষীগণকে এ অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে। (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্ব স্ব জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্টের অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে-অনুবাদক)।

৭। বিয়ের এলানের বেশ কিছু দিন পূর্বেই বিয়ে-ফরম পুরণ করতে হবে যাতে ফরম পুরণে যদি ঘাটতি থাকে বা কোন ভুল থাকে তাহলে শুদ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

৮। ৩ কপি বিয়ে-ফরমই সরাসরি পূর্ণভাবে পূরণ করতে হবে।

৯। বিয়ে-ফরম পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে পূরণ করতে হবে। যতদূর সম্ভব একই কলম ও কালি ব্যবহার করতে হবে।

১০। যেখানে কনে এবং বর বসবাস করে সেখানকার জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্টের অনুমোদন অবশ্যই আবশ্যকীয়। এছাড়া আমীর/প্রেসিডেন্ট তাদের সীলমোহর ব্যবহার করবেন, যদি থাকে।

১১। বিয়ের এলানের ১ মাসের মধ্যে দেশের আইনানুযায়ী বিয়ে রেজিষ্ট্রি করতে হবে। যেখানে ব্যবস্থা রয়েছে সেখানেই বিয়ে-ফরম রেজিষ্ট্রী করতে হবে। যদি কোন জামাতে এ সুযোগ না থাকে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রে রেজিষ্ট্রি করতে হবে। ওগুলো রেজিষ্ট্রি করার পূর্বে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের নিম্নবর্ণিত রসুম ও রেওয়াজ (কদাচার, কুসংস্কার ইত্যাদি) থেকে বিরত থাকা এবং অন্যদেরকে রক্ষা করা দরকার ঃ

১। "মোমেনগণ অযথা কার্যকলাপকে পরিত্যাগ করে, যখন তারা ব্যয় করে তখন অমিতব্যয়ী হয় না" —আল্‌ কুরআন।

২। তিনি [নবী করীম (সাঃ)] তাদের বোঝা এবং গলার ফাঁস হালকা করে দেন— আল্‌-কুরআন।

৩। বয়াত গ্রহণকারী সামাজিক কদাচার পরিহার করবে এবং কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে। (বয়াতের শর্ত থেকে)

৪। তাহরীকে জাদীদের মোতালেবার তথা দাবীসমূহের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই যে, জামাত নিজ সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের অভ্যেস করবে আর এভাবে জামাত ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে। এভাবে ধীরে ধীরে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যস্থ ব্যবধান দিন দিন কম হতে থাকবে। (তাহরীকে জাদীদের মোতালেবা-১৭৪ পৃঃ)

৫। সামাজিক কদাচারকে সমূলে উৎপাটন করে বাড়ী থেকে বের করে দেয়া প্রত্যেক আহমদী পরিবারের দায়িত্ব। [হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ)]

৬। আত্মীয়দের মাঝে ভাজী বন্টন করা, এটা গ্রহণ ও বন্টন উভয়ই শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম একইভাবে বাজী পোড়ানো এবং খোজা ও মেথরদের দেয়া এসব কিছু হারাম। (হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)]।

৭। দেন-মোহর স্বামীর ৬ মাস থেকে ১ বছরের আয়ের সমপরিমাণ হওয়া উচিত। [হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

৮। কনের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে অলংকার ও কাপড়-চোপড়ের দাবী উত্থাপন করা বেহায়াপনা বিশেষ। [হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

৯। আজকাল মেহদী এবং তৎসংশ্লিষ্ট যেসব অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়েছে তা আমার মতে অনৈসলামিক। [হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ।

১০। "সেহরা" (বরের মুখমণ্ডল ঢাকার জন্যে বিশেষ রকমের সাজ-সজ্জা—অনুবাদক)-এর প্রচলন বিদ'আত। ইহা মানুষকে ঘোড়ায় পরিণত করার মত। [হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

১১; টাকার মালা পরিধান করা বা একপ্রকার 'সারবালা' তৈরী করা বরের জন্যে বেহুদা কাজ এবং বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত।

১২। যথাসম্ভব 'জেহেষ' (মায়ের পক্ষ থেকে কনের জন্যে প্রস্তুতকৃত ও জমাকৃত উপহার সামগ্রী)-এর প্রদর্শনী থেকে বিরত থাকা উচিত। যা কিছু উপহারস্বরূপ দেয়া হবে তা যেন বাক্সবন্দী অবস্থায় দেয়া হয়। .....কেবল 'জেহেষ'-ই নয় বরং 'বারি'-(কনের পোশাক-পরিচ্ছদ)-এর প্রদর্শনীও একটি মন্দ জিনিষ। [হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

১৩। বরের পক্ষ থেকে কোন দাবী-দাওয়া উপস্থাপন করা অনৈসলামিক।

১৪। বিচ্ছিন্নভাবে পয়সাকে ছড়িয়ে দেয়া, বরের স্বর্ণের আংটি পরিধান করার আচার-অনুষ্ঠান বা কনেকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে অর্থ দাবী করা বা জুতো লুকানো বদ রুসুম বা খারাপ রীতি-নীতি।

১৫। বিয়ের সময়ে শ্বশুর বাড়ীর লোকদেরকে পুর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ উপহার দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। 'জেহেষ' সামগ্রীর প্রদর্শনী করা উচিত নয়। কনের শ্বশুর বাড়ীর লোকদেরকে পুর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ যেন না দেয়া হয়। (প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্)।

১৬। 'রুখসতানা' অনুষ্ঠান বা বিয়ে অনুষ্ঠানে স্থানীয় মেহমানদের খাবার খাওয়ানো নিষিদ্ধ। আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কেবল মাত্র ঠাণ্ডা বা গরম পানীয়ের

ব্যবস্থা করা যেতে পারে। [টিকা : পরবর্তীতে হযরত (আইঃ) ১৯৯০ সনের পাকিস্তানের মজলিসে শূরার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সনে এ সিদ্ধান্ত দেন যে, কনের পিতা কোনরূপ অপচয় না করে ও আড়ম্বরতা ব্যতিরেকে সাধ্যানুযায়ী অতিথি আপ্যায়ন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে হুযুর (আইঃ) ১২-২-৯৪ তারিখে মুলাকাত অনুষ্ঠানে এ অনুমতির কারণসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেন অনুবাদক]।

১৭। দাওয়াতে ওলীমা নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নত—কোন প্রকার বেহুদা এবং অতিরিক্ত খরচ যেন এতে না হয়।

"বরের উচিত যেন কতিপয় বন্ধু-বান্ধবকে খাবার পাক করে খাইয়ে দেয়।"

[হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)]

"মেহমানের সংখ্যা ১০-১৫ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা যথেষ্ট"

[হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

১৮। "স্বামী-স্ত্রী মিলন-এর পরে ওলীমা (বৌভাত) অনুষ্ঠান হওয়া দরকার"।

[হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

১৯। "না-মোহরাম (যাদের সাথে বিয়ে সিদ্ধ) স্ত্রী লোকেরা যেন বরের সামনে পর্দা করে এবং তার সাথে হাসি-ঠাট্টা না করে"। [হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

২০। না-মোহরাম স্ত্রী-লোকদের সাথে যেন বর-কনের ফটো না নেয়া হয়।

[হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)]

২১। এ ধরনের অনুষ্ঠানাদিতে মহিলারা যেন মহিলাদেরকে খাবার সরবরাহ করে। পর্দার পরিপন্থী কোন কাজ যেন না হয়।

২২। দাওয়াত ব্যতিরেকে কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া পাপ। তেমনি দাওয়াত দেয়া হয়নি এমন সন্তানদিগকেও নিয়ে যাওয়া পাপ।

নবী করীম (সাঃ) এমন আগন্তুককে চোর-ডাকাত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস]

সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, প্রত্যেক নর ও নারীকে অহেতুক খরচ এবং সামাজিক কদাচার ও বদ রসুম থেকে বিরত থাকা দরকার। আল্লাহ্ সকলের সাথী হোন, আমীন।

নেযারতে ইসলাহ ও ইরশাদ, রাবওয়া

সংগ্রহ ও অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল

(গুল)

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(চতুর্থ কিস্তি)

পুত্র—তাহলে হযরত আলী (রাঃ), যিনি ঐ সময়ে ছোট্ট শিশু ছিলেন, আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর ভাগে পড়ল তাই না আম্মু।

মা— ঐ যুগের একটি ঘটনা তোমাদেরকে শুনাচ্ছি। খানা কা'বার মেরামতের কাজ চলছিলো। সব কাজ প্রায় শেষ। 'হজরে আসওয়াদ' (কৃষ্ণ পাথর) স্থাপন করা বাকী ছিলো। 'হজরে আসওয়াদ' বড়ই সম্মানের বস্তু। প্রত্যেক গোত্রের সর্দারই চাচ্ছিল যে, সে 'হজরে আসওয়াদ' স্থাপন করবে। যুদ্ধ বাঁধার উপক্রম হলো। কেউ যুদ্ধ না করার জন্যে প্রস্তাব দিলো আর বল্লো যে, এরূপ সিদ্ধান্ত নাও যা সবার নিকট গ্রহণীয় হয়। কাল ভোরে যে-ব্যক্তি প্রথমে খানা কা'বায় প্রবেশ করবে তাকে দিয়ে সিদ্ধান্ত করাও। খোদার কী লীলা! পরের দিন ভোরে যিনি সর্বপ্রথম খানা কা'বায় প্রবেশ করলেন তিনি হলেন আমাদের নবী (সাঃ)। এখন মক্কার বড় বড় সর্দাররা একত্রিত হয়ে তাঁকে ফয়সালা করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন।

পুত্র—ফয়সালা করা তো বড়ই কঠিন ছিল।

মা—ফয়সালা করা তো কঠিন ছিল কিন্তু খোদাতা'লার সাহায্য তাঁর (সাঃ) সাথে ছিল। তিনি ফয়সালা করলেন যে, একটি চাদর নিয়ে 'হজরে আসওয়াদ' রেখে দাও। সবাই মিলে সে চাদরখানা যথাস্থানে উঠিয়ে নিলো। যখন 'হজরে আসওয়াদ' এতটা উচুঁতে উঠানো হলো যে, উহাকে স্থাপন করার স্থান আসল তখন তিনি (সাঃ) উহাকে উহার স্থানে রেখে দিলেন। বিচারকের এ রায় সবাই মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিলো এবং লড়াই বাঁধতে বাঁধতে থেমে গেল।

পুত্র—লোকেরা তো তাহলে তাঁকে (সাঃ) বড়ই সম্মান করতো।

মা—এরূপ বহু ঘটনাই ছিল যদ্দরুন লোকেরা তাঁকে খুবই সম্মানের চোখে দেখতো। তোমরা তো জানো যে, মূর্তি পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়। যদি তাদের নিকট কিছু চাওয়া হয় বা পরামর্শ চাওয়া হয় তাহলে তারা তা দিতে পারে না। আঁ-হযরত (সাঃ) মূর্তিগুলো পসন্দ করতেন না। একাকী বসে দোয়া করতেন এই বলে যে,

হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তুমি কোথায় আছো আমাকে বলে দাও। ঐ দোয়াগুলো খোদাতা'লা শুনতেন। স্বপ্নে তাঁকে সত্য ঘটনা বলে দিতেন। তাঁর স্বপ্নগুলো যখন অন্য লোকেরা পূর্ণ হতে দেখতো তখন মনে মনে ভাবতো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খোদা তো শুনেন। জবাব দেন তো কেবল স্বপ্নেই নয়। কখনও কখনও তিনি জাগ্রত ভাবেও কোন কোন ঘটনা দেখতেন। তিনি উহা সবাকে বলে দিতেন আর প্রকৃতপক্ষে অবিকল উহাই ঘটে যেতো। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হতো। তাই তাঁর ঈমান আরও শক্তিশালী হতো যে, কোন সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয় আছেন। তিনি ঐ স্রষ্টার সাক্ষাৎ লাভ করতে চাইতেন। দুনিয়ার আকর্ষণসমূহ তাঁর নিকট অনর্থক মনে হতো। হেরা গুহা নামে একটি গুহায় তিনি একাকী গিয়ে চিন্তা করতেন। কখন কখন হযরত খাদীজা (রাঃ)ও সঙ্গে যেতেন।

ছেলে—হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁকে নিষেধ করতেন না?

মা—হযরত খাদীজা (রাঃ) অনুভব করছিলেন যে, আমার মুহাম্মদ (সাঃ) কোন সাধারণ মানুষ নন। তিনি তাঁকে কোন কোন দিন খাবার তৈরী করে দিয়ে দিতেন। যখন তিনি বুঝতে পারতেন যে, তিনি অনেক দিন কাটিয়ে দিয়েছেন হয়ত খাবার শেষ হয়ে গিয়ে থাকবে তখন তিনিও খাবার নিয়ে যেতেন।

ছেলে—তাহলে কবে জানা গেল যে, তিনিই সেই রসূল যাঁকে সারা দুনিয়ার জন্যে খোদাতা'লা পাঠিয়েছেন?

মা—তাঁর বয়স ছিল তখন ৪০ বছর ১১ দিন। তারিখ ছিল ১২ই রবিউল আওওয়াল (অন্য মতে ৯ই রবিউল আওওয়াল-অনুবাদক) (ইংরেজী ৬১০ সনের ২০শে এপ্রিল অন্যমতে ১২ই ফেব্রুয়ারী—অনুবাদক)। তিনি হেরাগুহায় ইবাদত করছিলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) নামে এক ফিরিশ্‌তা আসলেন আর তাঁকে এই কথা বল্লেন, "আপনি আল্লাহ্‌র রসূল"। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) তাঁকে ওযু করা শিখালেন। তাঁকে দু'রাকাত নামায পড়ালেন। এভাবে তাঁকে ইবাদতের পদ্ধতি শিখালেন। আবার প্রায় ছয় মাস পরে রমযান মাসের শেষ দিনে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আসলেন এবং খোদার বাণী শুনালেন—'ইকরা'.....পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। ফিরিশ্‌তা এবং খোদার বাণী পেয়ে নয়; —অনেক বড় কাজ আমার ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে—এ কথা মনে করে। আমি এত বড় কাজ কীভাবে করবো! ফিরিশ্‌তা তাঁর বুকের সাথে বুক লাগিয়ে তাঁর সাহস সঞ্চার করলেন। খোদার এ বাণী পেয়ে তিনি সত্বর ঘরে পৌঁছলেন। তখন তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি কাঁপছিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) দেখলেন, তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (সাঃ) বল্লেন, "আমাকে কাপড় দ্বারা ঢেকে দাও, আমাকে কাপড় দ্বারা ঢেকে দাও"।

ছেলে—পরে কি হলো?

মা—সোনামনি আমার! তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছি তা স্মরণ রাখ, পরে আমি তোমাকে এর পরের কল্যাণমণ্ডিত জীবনের কথাবার্তা শুনাবো। আস আমরা দু'জনেই আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর জন্যে দরূদ (আশিস কামনা করা) পাঠ করি।

মা ও ছেলে—আল্লাহুম্মা সাল্লে'আলা মুহাম্মাদেও' ওয়া বারিকা ওয়া সাল্লাম আলায়হে।
(অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তুমি মুহাম্মদ-এর ওপরে আশিস বর্ষণ করো এবং কল্যাণ ও শান্তিও)।
আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য বর্ণনায় কাসীদাহ্ (কবিতা)
লেখক—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

ইয়া 'আইনা ফাইযিল্লাহি ওয়াল 'ইরফানী
ইয়াস'আ ইলাইকাল খালকু কায্‌যামানী

হে আল্লাহ্‌তা'লার কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রস্রবণ! লোকেরা পিপাসায় কাতর হয়ে তোমার প্রতি ধাবিত হচ্ছে।

— — —

ইয়া বাহরা ফায্‌লিল মুন'ইমিল মান্নানী
তাহভী ইলাইকায্‌যুমারু বিল কীযানী

হে পুরস্কার প্রদাতা ও অনুগ্রহকারী খোদার অনুগ্রহের সমুদ্র! লোকেরা দলে দলে কুঁজো নিয়ে তীব্র গতিতে তোমার দিকে ধাবিত হচ্ছে।
(টিকা—দু'টো পংক্তিই বালক-বালিকাদেরকে মুখস্ত করিয়ে দিন। জাযাকুমুল্লাহু আহ্‌সানুলজাযা)।

কুরআন মজীদ

মা—দিল মে এহী হ্যা হরদম তেরা সাহীফা চুমুঁ,
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা এহী হ্যাঁ।

অর্থ: সর্বদা প্রাণে এই আকাঙ্খা যে, তোমার পুস্তক (অর্থাৎ কুরআন মজীদ)-কে চুম্বন করি, কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি, কা'বা মোর ইহাই।।

ছেলে—আপনি তো সর্বদা এ কবিতাটি পড়তে থাকেন। কুরআন মজীদকে আপনি এত ভালবাসেন কেন, আম্মু?

মা—পবিত্র কুরআন কার কথা?

ছেলে—খোদার কথা, যা তিনি তাঁর প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে শিখিয়েছেন।

মা—তোমার কি জানা আছে, আজ পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতায় বর্তমান কুরআন মজীদ পড়া হচ্ছে তা কখন লেখান হয়েছিল?

ছেলে—আমার তো ইহা জানা আছে যে, কুরআন মজীদের যে অংশ আল্লাহ্‌তা'লা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে শিখাতেন তা-ই তিনি লিখিয়ে নিতেন।

মা—এর পরে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর শিখান পদ্ধতিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে লেখাতেন।

ছেলে—সাধারণতঃ তিনি (সাঃ) কোন্ কোন্ সাহাবী কর্তৃক কুরআন মজীদ লেখাতেন?

মা—হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)-কে দিয়ে। তুমি বলো, কুরআন মজীদের কোন আয়াতটি প্রথম নাযেল হয়েছিল?

ছেলে—ইক্‌রা বি ইস্‌মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক।

মা—কুরআন মজীদের সেপারা ও সূরা কতটি বলতো ?

ছেলে—৩০টি সেপারা ও ১১৪টি সূরা।

মা—তুমি তো অবগত আছো যে, প্রতিটি সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' লেখা আছে। পবিত্র কুরআনের একটি সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্' নেই আর একটি সূরায় ২বার 'বিসমিল্লাহ্' আছে।

ছেলে—সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' নেই আর.....

মা—সূরা নামলে ২বার এসেছে। এখন আস আমরা মনে করে করে ঐসব নবীগণের (আঃ) নাম বলছি যাঁদের নাম আমরা কুরআন মজীদে পড়ে থাকি।

ছেলে—হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস সালাম, হযরত ইসমাঈল আলায়হেস সালাম, হযরত ইয়াকুব আলায়হেস সালাম, হযরত ইউসুফ আলায়হেস সালাম।

মা—আরও হযরত ইসহাক আলায়হেস সালাম, হযরত মূসা আলায়হেস সালাম, হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম, হযরত যাকারিয়্যা আলায়হেস সালাম, হযরত ইলইয়াস আলায়হেস সালাম।

ছেলে—হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নাম অনুযায়ী একটি সূরাও তো আছে যার নাম সূরা মুহাম্মদ (সাঃ)।

মা—হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নাম ব্যতিরেকে আরও কয়েকজন নবীর নামে সূরা রয়েছে। সূরা ইব্রাহীম (আঃ), সূরা ইউসুফ (আঃ), সূরা নূহ (আঃ), সূরা লুকমান (আঃ), সূরা ইউনুস (আঃ)।

ছেলে—রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম পবিত্র কুরআনে কত বার এসেছে ?

মা—চার বার।

ছেলে—আপনি বলেছিলেন যে, পবিত্র কুরআন অল্প অল্প করে নাযেল হয়েছিলো। সব নাযেল হতে কত সময় লেগেছিল ?

মা—আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ৪০ বছর বয়সে নবুওয়ত লাভ করেন। আর ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময়ের মধ্যে অল্প অল্প করে খোদাতা'লা তাঁকে পবিত্র কুরআন শেখাচ্ছিলেন। এখন তুমি বলো কত সময়ে পবিত্র কুরআন নাযেল হয়েছিল ?

ছেলে—২৩ বছরে।

মা—এখন আমি তোমাকে কুরআন মজীদ থেকে উদ্ধৃতি বের করতে শিখাচ্ছি। যদি কোথাও লেখা থাকে—সূরা নেসা আয়াত ৭০ বা লেখা থাকে সূরা মায়েদা আয়াত ১১৮, সূরা ইউনুস আয়াত ১৭, তাহলে কীভাবে তা বের করবে ?

ছেলে—এতো খুব কঠিন বিষয় নয়। পবিত্র কুরআনের শেষে কোন সূরা কোন পারায় আছে তা লেখা থাকে। সেখান থেকে কুরআন পাক খুলে দেখা যাবে আয়াত নম্বর দেয়া আছে। এভাবে আয়াত বের করা যায়।

মা—বেশ তো, তুমি আমাকে এ তিনটি আয়াতের উদ্ধৃতি বের করে এগুলোরঅর্থ শুনাও।
ছেলে—সূরা নিসার ৭০ আয়াতের অর্থ :

"আর যে-ব্যক্তিই আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করবে সে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহগণ"।

মা—আবার সূরা মায়েদার ১১৮ আয়াতের উদ্ধৃতি বের করো এবং অর্থ বলো।
ছেলে—"এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাদের অভিভাবক ছিলাম। যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে"।
মা—এখন সূরা ইউনুস এর ১৭ আয়াত বের করো এবং অর্থ শুনাও।
ছেলে—"অবশ্যই ইতোপূর্বে আমি এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছি। তোমরা কি তবুও আক্কেল-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে না"?
মা—একেবারে ঠিক বলেছ। সাবাশ! উদ্ধৃতিগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে। আমি এর ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে বুঝাব, ইনশাআল্লাহ্।
ছেলে—আপনি আমাকে প্রথম পাঁচটি পারার নাম মুখস্ত করিয়েছিলেন। শুনাব কি?
মা—অবশ্যই শুনাও।
ছেলে—আলিফ লাম মীম্, সায়াকূলু, তিলকার রুসুল, লানতানালু এবং ওয়াল মুহসানাত।
মা—আল্ হামদুলিল্লাহ্। খোদাতা'লা তোমার স্মরণ শক্তি প্রখর করুন।

এখন আমি এর পরে পাঁচ পারার নাম তোমাকে শিখাচ্ছি। তুমি আমার সাথে সাথে বলতে থাকো।

লা ইউহেব্বুল্লাহু, ওয়া ইযা সামে'উ, ওয়া লাও আন্নানা, কালাল মালাউ এবং ওয়া'লামু।

———

"অতি দৃঢ়তার সাথে আমার অন্তরে এই আকাঙ্খা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কুরআন করীমের সূরা বাকারার প্রাথমিক সতর আয়াত .....প্রত্যেক আহমদীকে মুখস্ত করানো উচিত। আর যতটুকুন সম্ভবপর হয় এগুলোর ব্যাখ্যাও জানা দরকার এবং সর্বদা মনে জাগরূক থাকা উচিত। .....আমি আশা রাখি যে, আপনারা আমার প্রাণের গভীর থেকে উৎসারিত এ দাবীর ওপরে 'লাব্বায়েক' বলে এসব আয়াতগুলো মুখস্ত করার বন্দোবস্ত করবেন। ছোট বড় নির্বিশেষে সকলে এ সতর আয়াত কয়টিকে মুখস্ত করে নিবেন।"

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস, (রাহেমাল্লাহুতা'লা)]

টিকা—উপরোক্ত আকাঙ্খার সম্মানার্থে সূরা বাকারার প্রাথমিক সতরটি আয়াত অর্থসহ মুখস্ত করো।

(চলবে)

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

আমাদের প্রথম সন্তান জুয়েল আহমদ সেন্টার পরীক্ষায় ৫ম শ্রেণী হতে ১ম স্থান লাভ করেছে। এছাড়া সম্মিলিত মেধায় থানা পর্যায়ে (৫ম শ্রেণীতে) ৫ম স্থান অধিকার করেছে। সে উভয় স্থানে পুরস্কৃত হয়েছে। সে ১৯৯৫ সনের বৃত্তি পরীক্ষায়ও অংশ গ্রহণ করেছে। আমরা তার সার্বিক কল্যাণের জন্য দোয়া কামনা করছি।

মোঃ জালাল আহমদ
ও হাসীনারা জালাল

সংবাদ

স্থানীয় জামাতগুলো জলসার আয়োজন করুন

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত জলসা জামাতের লোকদের তালীম তরবীয়ত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষের জন্যে খুবই ফলদায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে। জলসার মাধ্যমে জামাতে নব-প্রাণের সঞ্চার হয়। সারাবছরের জমাকৃত শিথিলতা ও আলস্যের গ্লানি জলসার মাধ্যমে দূরীভূত হয়। এর মধ্যে আরও বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। তাই যেসব জামাতে স্থানীয় জলসা করা সম্ভব সেসব জামাতকে আসন্ন ঈদের পরবর্তী সপ্তাহ থেকে সারা মার্চ মাসের মধ্যে যেকোন সময়ে স্থানীয় জলসার প্রোগ্রাম তৈরী করে কেন্দ্র থেকে অনুমোদন নিয়ে জলসা অনুষ্ঠিত করার জন্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন।

পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক হোন

কাগজ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খরচাদি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, কোন আহমদীকে পাক্ষিক আহমদীর ফ্রী কপি প্রদান করা হবে না। প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের নামে একটি করে পত্রিকা পাঠানো হবে খুতবা পাঠের জন্যে ; তবে এজন্যে জামাতের নামে গ্রাহক হতে হবে। এ ব্যবস্থা বর্তমান সংখ্যা থেকে কার্যকরী হয়েছে। প্রত্যেক জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং যারা এখনও গ্রাহক হন নি সত্বর তাদেরকে জামাতের নামে গ্রাহক হতে বলা হচ্ছে।

o সুন্দরবন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক গত ১৩-১-৯৬ তারিখে কেন্দ্রের নির্দেশে ও সারকুলার মোতাবেক খেদমতে খালক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৫-৯৬ সালের সংগৃহীত শীতবস্ত্র গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

o গত ২২শে জানুয়ারী মোতাবেক ১লা রমযান বিষ্ণুপুর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, শীর্ষক এক সেমিনার স্থানীয় প্রেসিডেন্ট আমীর মাহমুদ ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

o গত ১৯শে জানুয়ারী বিকাল ৪ টায় মঃ খোঃ আঃ বি, বাড়ীয়ার সঙ্গে ঘাটুরা মজলিসের এক প্রদর্শনী ভলিবল ম্যাচ (ঘাটুরাতে) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলায় মঃ খোঃ আঃ ঘাটুরা জয়লাভ করে।

শুভ বিবাহ

গত ১১-১-৯৬ ইং তারিখ আহমদীয়া মুসলিম ইসলামগঞ্জ এর শাহ আকিল আহমদ এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র শাহ নূর আহমদ এর সাথে সেলবরস আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জনাব আনিস আলী সাহেবের কন্যা নাসরীন সানমের বিবাহ ১০,১০১/- (দশহাজার একশত এক) টাকা দেন-মোহর ধার্যে পাত্রীর পিত্রালয়ে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সেলবরস জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রমজান আলী সরকার।

উক্ত বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য প্রত্যেক আহমদী ভাইবোনের খাস দোয়ার আবেদন করছি।

শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইসলামগঞ্জ

সম্পাদকীয়ঃ

প্রকৃত ঈদ

পবিত্র মাহে রমযানের রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের দিনগুলো একে একে চলে গেলে। খোকা খুকুর নতুন দাঁতের মত শাওয়ালের এক ফালি ঈদের বাঁকা চাঁদ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌কে যেন ডেকে বলছে, আসো! ঈদ করো, আনন্দ স্ফূর্তি করো। আনন্দ স্ফূর্তি কিসের, তা ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এ আনন্দ স্ফূর্তি কি নতুন জামা-কাপড় পরার, আর সেমাই-জর্দা খাওয়ার? না রমযানের বোঝা আমাদের কাঁধ থেকে নেমে গেছে আমাদের আর দিনের বেলায় না খেয়ে থাকতে হবে না সে জন্যে? নাকি আমরা বড় লোকেরা ভাল ভাল দামী দামী কাপড়-চোপড় পড়ে ঈদের খুশীতে ভরপুর হয়েছি আর কতকগুলো লোক নগ্ন দেহে ভগ্ন স্বাস্থ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরছে আর বলছে, মা খাবার দিবেন, মা ফেৎরা দিবেন, এ জন্যে? নাকি ঈদ এজন্যে যে, পবিত্র আরব ভূমি ইহুদী নাসারা কর্তৃক দলিত-মথিত হয়েছে, অথবা প্যালেষ্টাইনের মুসলমানগণ ইহুদী কর্তৃক নিগৃহীত হচ্ছে বা মুসলমানগণ আপোষে লেবানন, আফগনিস্তান প্রভৃতি স্থানে লড়ছে আর ভাই ভাই এর রক্ত দেখে খুশীতে আটখানা হচ্ছে। এ খুশী কি প্রকৃতপক্ষে এ রকম নয় যে, কারও ঘরে লাশ পরে রয়েছে আর তারা আনন্দ স্ফূর্তিতে মশগুল?

ঈদ—যে খুশী বার বার আসে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জাতির জন্যে ইহা দু'বার এসেছিল। প্রথমতঃ আসহাবুল কাহাফদের জন্যে, যারা প্রায় তিন শতাধিক বছর ঈমানের সম্পদকে রক্ষা করার জন্যে মাটির গুহায় কঠোর জীবন—আসহাবে কাহাফের জীবন যাপন করেছিলেন। তারাও নিঃসন্দেহে একটা ঈদের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। আখেরীনদের মধ্যে অর্থাৎ রোমান সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত হযরত মসীহ নাসেরী (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে (সূরা মায়েদা :—১১৫) তারা ঈদ উপভোগ করে। তারা দুনিয়াতে প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করে। এমন কি সারা দুনিয়ার রেযকের ভাণ্ডার অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত রুটির পাহাড়ের মালিক বনে এক প্রকার ঈদ-সুখ লাভ করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও মুসলমানগণ এক প্রকার ঈদ আস্বাদন করেছিলেন। কিন্তু ফাইজে আওয়াজের (বক্র পথ ভ্রষ্টতার) যুগে তারা ঈদ থেকে বঞ্চিত হয়। 'মুহাম্মদী মসীহ' (আঃ)-এর যুগে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় খেলাফত 'আলা মিন হাজিন নবুওয়তের ব্যবস্থায় খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুনরায় মুসলমানগণ ঈদের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করবে বলে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে জ্ঞাত হওয়া যায়। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে সে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। বিশ্ব মুসলিম যত শীঘ্র সে খেলাফতকে গ্রহণ করে তাদের অনৈক্য দূর করে ঐ এলাহী কর্মকাণ্ডের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করবে তত শীঘ্র তারা সেই প্রতিশ্রুত প্রকৃত ঈদকে প্রত্যক্ষ করবে এবং দুনিয়াতে তখন পুনরায় আল্লাহ্‌তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে আর তখন ধর্ম বলতে ইসলামকেই বুঝাবে ও নেতা বলতে বুঝাবে আমাদের প্রিয় ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে।

ঈদের শুভেচ্ছা

আমরা আমাদের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই ঈদ মোবারক। এ ঈদ সবার জন্য নির্মল আনন্দ ও সত্যিকারের খুশী বয়ে নিয়ে আসুক।

১৫ ও ১৬শ (বিশেষ) সংখ্যা ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬

Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

MUSLIM TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করছে। প্রতি শুক্রবার নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে শুনতে পাবেন।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272